জন্ ওভসেনাসেক

এক মুঠো ভালবাসা

অনুবাদ

অসিত সরকার

পরিবেশক। কথা ও কাহিনী। ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২

Czech Novel
ROMEO AND JULIET AND THE DARKNESS
by JAN OTCENASEK
Published by arrangement with DALIA 1965.

ত্রিপলীনা
প্রথম প্রকাশ । অক্টোবর ১৩৭২
প্রকাশক । আদিত্য মিত্র । ৩৭/১ বীরেন রায় রোড, পূর্ব । কলকাতা-৮
মুদ্রক । কার্ডিনাল প্রিন্টার্স । ৪/১ সনাতন শীল লেন, কলকাতা-১২

একমুঠো
ভালবাসা
একরাশ
অন্ধকার

জুলিয়াস ফুচিককে

পুরনো বাড়িগুলো যেন বৃদ্ধ মানুষের মতো—স্মৃতিভারাবনত।

পুরনো বাড়িরও নিজস্ব জীবন আছে, স্বতন্ত্র একটা অবয়ব। জীর্ণ দেওয়ালের পাঁজরে পাঁজরে আজ খুব অল্পই খুঁজে পাওয়া যাবে স্পন্দিত মানুষের স্মৃতিচিহ্ন। শহরের উপকণ্ঠে সারবন্দী খুপরির মতো জীর্ণ, নিঃসঙ্গ এই পুরনো বাড়িটার হয়তো আজ আর কোন ইতিহাস নেই। তবু দেওয়ালে দেওয়ালে ওদের জীবনের স্পন্দন। দীর্ঘায়ত জীবনের অতীত স্মৃতি নিয়ে ওরা আজও উচ্ছল, মুখর।

কি দেখেছে ওরা, কিইবা শুনেছে ?

পুরনো বাড়িরও নিজস্ব একটা ভাষা আছে,কান পেতে শোন—আঙিনার ওপর ঝোলানো বারান্দায় কে যেন ক্লান্ত পায়ে হেঁটে চলেছে, আনমনে শিস দিতে দিতে। হঠাৎ থেমে গেল, দেওয়ালে কেঁপে উঠলো দেশলাইয়ের কাঠির ছোট্ট একটা আলোর শিখা। আবার টেনে চলা সেই ক্লান্ত পায়ের শব্দ, জীর্ণ কাঠের ঘোরানো সিঁড়িতে বিষণ্ণ প্রতিধ্বনি। আবছা আলোয় কোথায় যেন বেতারের গুঞ্জন। দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ, শিশুর কান্না।

দুহাতের নিচে মাথা রেখে, আবছা আঁধারে ঢাকা জানলার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে সে শুয়ে আছে। জানলার ওপারে ঝোলানো বারান্দার নড়বড়ে টালি আর জীর্ণ রেলিংএর একটানা মৃদু শব্দ। ছাদের কিনার থেকে উঠে আসা গ্রীষ্ম রাত্রির তপ্ত দীর্ঘশ্বাস। ওপরের সবকিছুই এখন নিস্তব্ধ নিথর। সান্দ্রনীল আকাশে উত্তর-নক্ষত্রপুঞ্জের সবচেয়ে জ্বলজ্বলে উজ্জ্বল তারাটাও নিশ্চুপ। ছেঁড়া মেঘের প্রান্ত থেকে চাঁদের একটুকরো আলো জানলা দিয়ে এসে পড়েছে ঘরের ভেতরে—যেন ভাষাহীন স্নিগ্ধ একটি মুখরেখা।

শহরের উপকণ্ঠে রাত্রি নেমেছে।

সে শুনতে পেলো তার মৃদু পায়ের শব্দ। কপালের দুপাশে মর্মরিত গুঞ্জন, ফিসফিস নৈঃশব্দ ভরা হৃদয়ের নিভৃত সংলাপ আর দেওয়ালে সময়ের জাল বুনে চলা পুরনো ঘড়িটার একটানা ক্লান্তিকর ছন্দ। ঘড়ি ? না তার হৃদয় ?

বুকের মধ্যে সে যেন এখনো শুনতে পায় বিরামবিহীন বেজে চলা উদাত্ত ঘণ্টাধ্বনি। কপালের শিরায় শিরায় চলকে ওঠে রক্তস্রোত। এবং তখনি তার ভাবনা যেন তাকে টেনে নিয়ে যায় সীমাহীন কোন গহন অরণ্যে।

শহরের সীমানা থেকে দূরে ছোট্ট একটা খুপরির সংকীর্ণতায় বিষন্ন দৃষ্টি মেলে সে এখনো শুয়ে। এখান থেকে ফেরা, ফিরে আবার এখানে আসা—আশ্চর্য, ছিন্নবাধা জীবনের কয়েকটি বছর তিল তিল করে হারিয়ে যাযাবরের মতো কোথা থেকে শুরু এই নিরুদ্দেশ তীর্থযাত্রার? কি এক অসহ্য যন্ত্রণা যেন দেওয়ালে মাথা কুটে মরতে চায়। না না, সে তা পারে না। অসম্ভব। বরং এর চেয়ে ঢের ভালো শুধু এই চুপচাপ নিস্তব্ধতা। আঠেরো বছরের কোন জীবনে এ এক দুঃসহ যন্ত্রণা! এরচেয়ে অনেক ভালো ভাবনাবিহীন এই আশ্চর্য উদাসীনতা। ভাবনাবিহীন! কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব? চোখের পাতাদুটি বন্ধ করে, যেন সুমুদ্রিত ঝিনুকের উষ্ণ দুটি খোলের নিবিড়তায় নিজেকে হারিয়ে ফেলা—এ পৃথিবী, নিজের হৃদয় থেকে অনেক অনেক দূরে।

অবুঝের মতো সে বন্ধ করে থাকে চোখের পাতা। সব কিছুই এখন অন্ধকার। নিতল অন্ধকার। অন্ধকারের অতলান্তে যে হারিয়ে যাচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছে—যার কোন শেষ নেই, আশা নেই বিবর্ণ হয়ে মিলিয়ে যাবার শেষ শূন্যতায়, যার কোন রূপ নেই, স্পষ্ট কোন রেখা। স্মৃতি! স্মৃতি শুধু যন্ত্রণার, ভাবনা আর দীর্ঘশ্বাসের। বেঁচে থাকার রিক্ত যন্ত্রণা ভরা এ এক আশ্চর্য স্মৃতি। পৃথিবীটা হঠাৎ কেমন যেন বদলে গেছে, হারিয়ে গেছে তার যত অতীত কাহিনী।

কোন পথ নেই। কেমন করে সে এগোবে? যেন কত যুগ নিষ্ফল পরিক্রমার বেলাশেষে যেখানে এসে সে দাঁড়িয়েছে, দিগন্ত সেখানে উধাও।

কিন্তু তোমাকে বাঁচতে হবে!

সে শুনতে পেলো একটি কণ্ঠস্বর।

কোথা থেকে এলো এই কণ্ঠস্বর? এত স্বচ্ছ, এমন গভীর। তুমি এখানে! শুনতে পাচ্ছো না আমার কণ্ঠস্বর?

একটু পরেই সিঁড়িতে সে শুনতে পেলো মৃদু পায়ের শব্দ। বিস্মৃতির অতল থেকে কে যেন তাকে টেনে তুললো। অর্ধনিমীলিত দুটি চোখ। চোখের পাতায় একরাশ যন্ত্রণা। কান পেতে সে শুনলো পরিচিত কার টেনে চলা জুতোর শব্দ, যেন কোন সুদূর থেকে কাছে এসে হঠাৎ থেমে গেল। তবু সে নিস্তব্ধ, নিথর। এমন কি দরজায় যখন শুনলো মৃদু কড়া নাড়ার শব্দ, তখনো।

'পল! তুমি এখানে?'

রুদ্ধ তার নিশ্বাস। অশ্রুতে ভিজে এলো চোখের পাতা। সে বাধা দিলো

না। মুক্তির অমিত আনন্দে তারা টুপটাপ ঝরে পড়লো। সে শুনতে পেলো তার নিজের নিশ্বাসের ক্লান্ত স্পন্দন।

দরজার ওপারে যে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলো সে এখন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ও আবার শুনলো সেই কড়া নাড়ার শব্দ। 'তুমি কি শুনতে পাচ্ছো না পল— আমি। বোকা ছেলে কোথাকার, দরজা খোল…'

তবু সে নিশ্চুপ। মৃত্যুর মতো নিস্পন্দ, নিথর।

ভয় তার কথা বলার। ভয় অযথা উপদেশের। তাছাড়া কিইবা বলার আছে? বলবে যা সত্যি? সে তো সহজ। আমি আর চলতে পারছি না এই-টেই সব। জানি, আমার সঙ্গে তুমি একমত হবে না। তুমি যে বৃদ্ধ, তাই তোমার সত্যটাও ভিন্ন। তুমি হয়তো বলবে বোধের কথা। আমি বলবো ওসব বানানো, মিথ্যে। তুমি এমন কোমল, এত সরল, যেন পৃথিবীর কাছে আত্ম-সমর্পণ করে বসে আছো। বোধ! কি প্রয়োজন বোধের, যখন নিজের স্পন্দনেও আমি ভয় পাই। মনে হয় এ বুঝি আমার নয়। বুঝি সব শেষ করে দিতে পারলে বাঁচতাম, অথচ সে শক্তি আমার নেই। আমাকে তুমি কি করতে বলো? বাঁচতে? কিন্তু কেন? কাল রাতে যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে-ছিলাম, সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে জলের দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে ছিলাম। না, জল আমাকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি। এখন বুঝতে পারছি, কোনদিনই তা আমি পারতাম না। সেখানে শুধু দাঁড়িয়ে ছিলাম, আর কিছু নয়। দূরায়ত চোখে যখন তাকিয়ে ছিলাম, অদূরে তোমাকে দেখলাম। রাস্তার সবুজ আলোর নিচে তুমি দাঁড়িয়ে। জীর্ণ কোট, বয়েসের ভারে নুব্জ। শ্রান্তিতে তুমি কাঁপছিলে আর দৃষ্টি রেখেছিলে আমার দিকে। আমি জানি, সরল বিশ্বাসেই তুমি ভেবেছিলে আমি তোমাকে দেখতে পাইনি।

বাবামনি!

'পল…'

পাহাড় ডিঙিয়ে দূরে, অনেক অনেক দূরে! কিন্তু কোথায় যাবে? মাকড়-সার মতো রূপালী সুতোয় সেই একই কেন্দ্রে আবার ফিরে আসা!

মনে পড়ে কেমন করে প্রথম গ্রীষ্মের সেই সকালটা টুক করে ঢুকে পড়লো তার ছোট্ট খুপরিতে। কি নিঃসীম আবিলতায় না ভরা ছিলো স্মৃতির সেই দিনগুলো! গীটারের সুর। বইগুলো ছড়ানো চারদিকে। আসলে কিছুই বদলায়নি। সেই একই পুরনো স্প্রিংএর সোফা। জ্যোতির্বিদ্যার পুরনো মান-

চিত্র। জীর্ণ চেয়ার আর এনামেলের ভাঙা ওয়াসবেসিন। জানলার নিচে ছোট্ট একটা টেবিল। চীনামাটির পেঁচা। কাগজের সেড দেওয়া বাতিদান। হাতে তৈরি ছোট্ট একটা রেডিও। সম্ভ্রান্ত দর্জির দোকানের পাশে পরিত্যক্ত এই নির্জন ঘরটায় তার নিজস্ব একটা পৃথিবী গড়ে তোলার চেষ্টা দেখে বাবা হাসতেন। ঘরের দুটো দরজা। একটা দোকানের দিকে, ভেতর থেকে বন্ধ। অন্যটা বাইরের বারান্দার দিকে। শহরের পুরনো দোকান থেকে কিনে আনা যত জীর্ণ আসবাব। ভাবলে ছোট্ট খুপরিটা কিন্তু মোটেই অপরিচ্ছন্ন নয়।

এখানেই সে সারাদিন পড়াশুনা করতো আর স্বপ্ন দেখতো। দরজাটা বন্ধ করলেই নিজেকে মনে হতো স্বাধীন। এখানেই সে যৌবনের প্রথম স্বাদটুকু অনুভব করেছিলো। হয়তো কখনো কোন নারী এসে দাঁড়াতো ভেতরে। সে তাকে চিনতে পারতো না। দেখতে পেতো না তার মুখ। শুনতে পেতো না তার কণ্ঠস্বর। কেননা সে তো সত্যি নয়। সে শুধু তার অস্পষ্ট কামনায়, তার হৃদয়ের প্রতিবিম্বে শিল্পের নিপুণ কারুকার্যে গড়া কোন নারী। লজ্জা পেতো নিজের মনেই। কিন্তু একদিন সত্যি সে আসবেই। কবে? কেমন দেখতে হবে তাকে? চিনতে পারবে? নিশ্চয়ই! চলমান মুখের মিছিলেও সে চিনতে পারবে সেই মুখ। অপলক চোখে সে তাকিয়ে থাকবে। তারপর? না, আর কিছু নয়। একরাশ অবাক বিস্ময় আর দূরায়ত চোখে শুধু অজস্র কথা।

দোকান থেকে সারাদিন গুনগুন একটানা ভেসে আসতো সেলাইমেসিনের শব্দ। শিক্ষানবীশ ছেলেটার সঙ্গে বকবক করে চলে দর্জি চিপেক। আর বাবার রুক্ষ ভারি কণ্ঠস্বর: বেশ, আপনার যা ইচ্ছে স্যার। বলেন তো কুঁচিটা খুলে এখানটা জুড়ে দেবো, দেখতেও ভাল হবে। বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে কেউ হয়তো কখনো অলস চোখে জানলার দিকে তাকিয়ে থাকতো, কিন্তু শার্সির গায়ে জমাট ধুলো ভেদ করে কিছুই স্পষ্ট দেখা যেতো না।

মাঝে মাঝে ক্লাস-পালানো ছেলেরা দল বেঁধে হানা দিতো তার ছোট্ট ঘরটায়। সারাদিন পাড়া মাথায় করে হৈ চৈ করতো। কিন্তু এ সবের মধ্যে যে দিন কাটিয়েছে, সে বোধহয় অন্য কেউ—একজন যুবক সে যখন লুকিয়ে বাবার ব্রাশ আর ক্ষুর নিয়ে নিতান্ত অর্থহীন ভাবেই কোমল চিবুকে বুলিয়ে যেত, তার ধারণা কোন মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলে বুঝি এই ভাবেই আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে হয়। দেখো দেখো, শেষে আবার গালটা কেটে ফেলো না যেন। বাবা সোজাসুজি পরামর্শ দিতেন, কিন্তু তাঁর মুখাবয়বের ভাঁজে ভাঁজে

গোপন থাকতো একটুকরো প্রচ্ছন্ন হাসি।

বাবা আর সে দুজনে সুন্দর করে মিশেছে নিজেদের মধ্যে। বাবা তাকে উৎসাহ দিয়েছেন, বুঝিয়েছেন, এমন কি পরিণতের মতো ব্যবহারও করেছেন। আর সেও তার আঠেরো বছর জীবনের প্রতিটা পদক্ষেপ বাবার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে এসেছে। এমন কোন অস্বস্তিকর প্রশ্ন তিনি কোনদিনই করেননি, যাতে তার মিথ্যে বলার প্রয়োজন হতো। যদিও বয়েসের পার্থক্য প্রচুর, তবু দুজনের মধ্যে বোঝাপড়াটা ছিলো সহজ। বৃদ্ধ দম্পতির একমাত্র শিশু—অন্তহীন উৎকণ্ঠার পাখার নিচে আশ্রয় দিয়ে মানুষ করে তুলেছেন।

বৃদ্ধ হলে মানুষ অকারণেই ভয় পায়, তাদের সাথে ধৈর্য রেখে চলতে হয়। তারা শোনাবেন ঘাসেরা নিভৃতে বেড়ে উঠছে, আর বিপদ ওত পেতে আছে আনাচে কানাচে। বিশেষ করে মা—এটা করো না, ওটা করো না…পল,পলি-সোনা। ওদের সঙ্গে মিশো না, লক্ষ্মীটি। পুরুষসুলভ দৃঢ়তায় সে শুধু শুনে যেতো ওদের উৎকণ্ঠিত অনুনয়, মনে ক্ষীণ সন্দেহ জাগতো একটানা বিলাপের মধ্যে ডুবে গিয়ে ওরা বোধহয় নিঃসীম আনন্দ পেতেন! যুদ্ধ অবশ্য শুরু হয়ে গেছে। জার্মানরা বিধ্বস্ত করেছে সীমান্ত, ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে। বাতাসে সমুদ্রে শহরে বুঝি অন্তহীন তাদের বিজয় উল্লাস। চারদিকে শুধু মৃত্যুর তাণ্ডব।

সব ব্যাপারেই মা বাইবেল থেকে একটা না একটা উপমা খুঁজে বের করবেন। স্কুলে অক্লান্ত পরিশ্রম করে শিখতে হবে নাৎসী সন্ন্যাসীদের জীবন ইতিহাস। না করলে জার্মান ইন্সপেক্টরের হাতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশের কোন আশা নেই। বিখ্যাত ইয়ারম্যাচ আবার জলমগ্ন করেছে অসংখ্য যুদ্ধ জাহাজ, এখন এগিয়ে চলেছে মস্কোর দিকে। বেতারে হিটলারের প্রতি আনুগত্য আর দম্ভোক্তিতে চোয়াল ধরে যাবার জোগাড়। নাকের ডগায় চশমা এঁটে রোজ সন্ধেবেলায় মা রান্নাঘরে তাঁর চেক বাইবেলটা খুলে পড়বেন। অন্য দিকে বসে থাকবেন বাবা, কাপড়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বকবক করবেন। জাদুকর ছাড়া নাকি কেউ এমন টুকরো কাপড় দিয়ে সুট তৈরি করতে পারে না। এখন তিনি আর শনিবার সন্ধ্যায় জোসেফ ম্ল্যাপেথের বিধবা বউয়ের সঙ্গে ফ্ল্যাস্ না খেলে ঘরে বসেই জিরাসেখের ঐতিহাসিক উপন্যাস পড়েন। তাঁর দেশপ্রেম একটু সাবেকী ধরণের, অনেকটা নিজের হাতে তৈরি পুরনো সুটের মতো।

উঃ কি রক্তাক্ত জীবন।

কি এসে যায়—ওরা যেমন এসেছে, তেমনি আবার চলে যাবে। মিত্রপক্ষ এদের তাড়িয়ে দেবে, তারপর সব শেষ। কিন্তু তার কি হবে? জীবনে আঠেরো বছর একবারই আসে। সে চায় দুঃসাহসিকতা, যদিও স্পষ্ট জানে না কি…তবু অন্তহীন একটা কামনা, বুঝি বিতৃষ্ণা তার প্রতিটি রক্তস্রোতে দুঃসহ যন্ত্রণার চাবুক হানে। জঘন্য সামাজিক অনুশাসন তার যন্ত্রণা, যন্ত্রণা তার স্কুলের নগ্ন পরিবেশ। কিন্তু কিইবা করতে পারে। নিরুদ্ধ এক চিলতে জায়গার মধ্যে কেমন করে সে বাঁচবে, বাঁচবে বিবর্ণ নিস্প্রাণ টেনে চলা এই জীর্ণ ক্লান্তির মোহ থেকে ··শান্তি পাবে নিজেকে তিলে তিলে নষ্ট করে। কিন্তু কি লাভ রিক্ত পতঙ্গের মতো কঠিন দেওয়ালে কেবলই মাথা কুটে!

আর সেই ভীরু মেয়ে…পেত্রিন পার্কের অলস কয়েকটি মুহূর্ত। পরিণতির আগেই ছোট্ট একটি চুম্বনের মৃত্যু…বাসী সেন্টের এক ঝলক মিষ্টি গন্ধ, অজানা কামনার মৃদু শিহরণ। তবু সবকিছুই সে মুছে ফেলতে চেয়েছিলো। না, নিজের কাছে সে এতটুকু দুর্বল হবে না। তাহলেই কি সব! মাঝে মাঝে সে জীবনটার কথা ভাবতো—এই, শুনছো। এভাবে লোকে বাঁচে না। হয়তো না। জার্মানরা মানুষকে বন্দী করছে জেলে, খুন করছে নির্মমভাবে—কিন্তু তুমি একা সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কি করবে, শয়তানরাই যখন টেনে এনেছে এই ক্লেদাক্ত নরক। যদিও কেউ তাকে জিগেস করেনি, তবু সে ভেবেছে ··পরীক্ষার পর সাময়িকভাবে হয়তো কোন বারুদের কারখানায় কাজ নেবে, কিংবা যাকিছু সঞ্চয় নিয়ে পাড়ি দেবে রাইখে, ডিক হুইটিংটনের মতো নয়, বেগার কোন শ্রমিক হিসেবে, যেখানে সে তিলে তিলে নিজেকে নষ্ট করবে। কিংবা এমন কোন কাজ করবে যা সে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ঘৃণা করে। আঃ কি রক্তাক্ত এই কয়েকটি বছর! অনির্দিষ্ট কালের জন্যে স্বপ্নগুলোকে মুছে ফেলা যায় না? কিন্তু তবু তাকে বেঁচে থাকতে হবে। যেভাবেই হোক। এমনকি আজও…

পাহাড় ডিঙিয়ে দূরে, অনেক অনেক দূরে।

দেওয়ালের ওপারে ঘড়িটায় গুরুগম্ভীর সুরে এগারোটা বাজলো। ঢং ঢং। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ নিঝুম। ছোট ঘরটায় সে শুধু একা জেগে, দুহাতে মাথা রেখে অন্ধকারে দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ অপলক। অশান্ত ভাবনাগুলো তার বুকের মধ্যে আবার তোলপাড় করে উঠলো। একে একে ফিরে এলো সব স্মৃতি।

সেদিন প্রবেশিকা পরীক্ষা শেষের একটা বিকেল…

১

'পল—' অন্ধকার থেকে ভেসে এলো।

সেই কোমল কণ্ঠস্বর তাকে বিস্মিত করলো না, অথচ মনের মধ্যে গাঁথা।

'বলো।'

'এখন কি হবে?'

বারবার সেই একই প্রশ্ন। একই অন্তহীন জিজ্ঞাসা। তবু সে বিস্মিত হলো না। প্রথম কয়েক দিনেই সে জেনে নিয়েছে কেমন করে নিশ্চুপ থাকতে হয়, অন্তত একটি মুহূর্তের জন্যে। পরের সবটুকুই তো জটিল। কেননা একই উচ্চারিত প্রশ্ন যখন বিবর্ণ হয়ে বাতাসে হারিয়ে যায়, তখন ওকে দুবাহুর নিবিড়তায় জড়িয়ে চুম্বন ছাড়া সে আর কিছুই ভাবতে পারে না। এইই সবচেয়ে সহজ আর মর্মলীন। চুম্বনের সময় সে ওকে কিছু বলবে, হয়তো ওর ভাবনাকে অতল জলের রেখার মধ্যে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, তারপর...কোন প্রশ্নই আর প্রশ্ন থাকবে না। কিন্তু কিইবা ওকে বলতে পারতো? কত অফুরান সম্ভাবনাই না ছিল। হয়তো অজস্র। হয়তো একটাও না। কিংবা সবকিছুই 'হয়তো!'

চকিতে সে উঠে দাঁড়াতো। সোফা আর টেবিলের মাঝে সংকীর্ণ পথটুকুতে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে মাথায় যা আসতো বলে যেতো। কখনো নিজেরই শব্দে অবাক হয়ে যেতো, কখনো তন্ময় চিন্তার গভীরে ডুবে যেতো। প্রথমে সবকিছুই মনে হতো স্বাভাবিক। এই তো আমরা এখানে। ও আর আমি। এর পর থেকে সরিয়ে নাও এই শহর এই দেশ সারা পৃথিবী। তাহলেই হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে। আবার সেই 'হয়তো!'

পকেট থেকে একটা দোমড়ানো সিগারেটের প্যাকেট বের করে সে দেশলাই খোঁজে। আর ওর নিবিড় চোখ দুটো তাকে অনুসরণ করে।

'সিগারেট ধরিও না লক্ষীটি। জানো, রাত্রে এখানের বাতাস এমন গুমোট বেঁধে থাকে।'

সত্যি। ও ঠিকই বলেছে। প্যাকেটটা আবার সে পকেটে ভরে রাখে। ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠে এক টুকরো ম্লান হাসি।

সবকিছুই আবার তার স্মৃতিতে একসাথে ভিড় করে আসে। ছোট্ট একটা সিগারেটের প্যাকেটকে কেন্দ্র করে তাদের পরিচয়ের সূত্র। মাঝে মাঝে অতি সাধারণ, তুচ্ছ কিছু থেকে অনেক কিছু শুরু হতে পারে। যেমন জীবনে প্রথম

সিগারেট। বিজ্ঞের মতো কোন পত্রিকার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে সযত্নে একটা সিগারেট বের করে দুঠোঁটের মাঝে রাখা, তারপর পরিণত এক পৃথিবীর কেন্দ্রে পৌঁছে যাওয়া। সে এক আশ্চর্য অনুভূতি! আঠের বছরের জীবনে বাবার কাছ থেকে এখন আর সিগারেট চেয়ে নেওয়ার কোন সংকোচ নেই। মাও শোনাবেন না শরীর নষ্ট হওয়ার অভিযোগ কিংবা নীরব চোখের ভৎসনা। ওসবের পালা এখন শেষ! এখন শুধু চাপা উত্তেজনায়, তামাকের গন্ধে ম' ম' করা আবছা অন্ধকার দোকানটায় গিয়ে বলা : এই যে মিসেস বারাসেক, আমায় এক প্যাকেট দিন তো।

পরীক্ষা শেষের বিকেল থেকেই যন্ত্রণায় কপালটা দপদপ করছিলো। পকেটে সিনেমার টিকিট। কিন্তু তখনো দু ঘন্টা বাকি। সংবাদচিত্র শেষ না হলে কেউই ভেতরে যায় না।

কিছু খেয়ে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়। বেলা শেষের রোদে স্নানকরা রাস্তার বুক থেকে উঠে আসছে মৃদু উত্তাপ। অথচ বসন্তের গোধুলি সন্ধ্যা সবার চোখ এড়িয়ে কখন যে ঢুকে পড়েছে শহরে কেউ জানতেই পারে নি। এভাবে একা একা পথ চলতে তার ভীষণ ভাল লাগে। যেন স্বপ্নের মধ্যে সে ডুবে যায়। পকেটের মধ্যে হাত গুঁজে দোকানের অন্ধকার জানলার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া, ভিড়ের মধ্যে এদিক ওদিক ঘোরা, চকিতে একবার আড়চোখে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে দেখা, সত্যি এ এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি! কোমল দেহ ঘিরে হালকা স্কার্ট থেকে ছড়িয়ে পড়া নাম না জানা স্নিগ্ধ গন্ধ। কি এক অতনু আবেগে থরথর কেঁপে উঠবে সারা শরীর। যদি ওদের কারো কাছে গিয়ে বলা যায় : সুসন্ধ্যা। যদি কিছু মনে না করেন…অসম্ভব! কোন দিনই সে তা পারবে না।

টাউন হলের চূড়ায় বড় ঘড়িটার দিকে সে তাকিয়ে দেখলো।

এখনো অনেক সময়।

ভাবলো পার্কে গিয়ে সিগারেট ধরাবে। মুঠোমুঠো উপভোগ করবে সন্ধ্যার উতল নির্জনতা।

এখানেই ওদের প্রথম আলাপ।

বেঞ্চের একপ্রান্তে গিয়ে সে বসলো। অন্য প্রান্তে কেউ আছে কিনা দেখার কোন প্রয়োজনই অনুভব করেনি। সত্যিই এমন গভীর চিন্তায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলো যে মেয়েটিকে প্রথমে সে লক্ষ্যই করেনি। মানুষের দেহাবয়বের

মতো অস্পষ্ট অন্ধকারে শুধু একটা ছায়া। নিজেকে টানটান করে মেলে দিয়ে সে সিগারেট ধরালো।

পেছনে একটা এলডারবেরীর ঝোপ। ফুল ফোটার কাল এসেছে শেষ হয়ে। আবছা আলোয় ফুলগুলোকে মনে হচ্ছে বিবর্ণ ধূসর। শুধু একটা মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে বাতাসে। বাড়িগুলোর পেছনে ঢলে পড়েছে বেলা শেষের সূর্য। গাছের দীঘল ছায়াগুলো হারিয়ে যাচ্ছে ঘাসের গভীরে। মাঝে মাঝে পরস্পরে নিবিড় প্রণয়ীযুগল তার পাশ দিয়ে গল্প করতে করতে হেঁটে যাচ্ছে, কিংবা কোন বৃদ্ধা রেশমী শাল জড়িয়ে ছোট্ট লোমশ কুকুরটাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। তবু পার্কটা প্রায় নির্জন।

শহরের সান্ধ্য কোলাহল ভেসে আসছে যেন অনেক অনেক দূর থেকে।

সে হাই তুললো।

দীর্ঘশ্বাস না! তাড়াতাড়ি সে মুখ ফিরিয়ে তাকালো।

বেঞ্চের অপর প্রান্তে তখনো নিজেকে অদ্ভুতভাবে গুটিয়ে ও বসে আছে। কোলের ওপর ডান হাতে আঁকড়ে রয়েছে ছোট্ট একটা সুটকেশ। সচকিত, যেন এখনি কেউ ছিনিয়ে নেবে। মাথাটা নুয়ে পড়েছে বুকের কাছে। সে শুধু দেখতে পেলো ওর মুখের একটা অংশ। কালো চুলের নীচে আবছা আলোয় ওর মুখটা মনে হলো বিবর্ণ। পাতলা স্কার্টের নিচে হাঁটুদুটো পরস্পর সুসংবদ্ধ।

ও এমন নিস্তব্ধ বসে, যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

একরাশ স্তব্ধ বিস্ময়ে সে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলো। আপ্রাণ চেষ্টা করলো দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে, পারলো না। এমন তন্ময় একা একা এর আগে সে কোনদিন বসেনি। তুমি কি তোমার তরুণ প্রেমিকের জন্যে অপেক্ষা করছো! একটু পরেই অবাক হয়ে সে অনুভব করলো ও কাঁদছে। শিশুর মতো, অবরুদ্ধ যন্ত্রণায় ফুলে ফুলে কাঁদছে।

সিগারেটের শেষ অংশটুকু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে প্রাণপণ চেষ্টা করলো কিছু বলার।

'তোমার কি কিছু হয়েছে?'

মেয়েটি নড়লো না। এমনকি ফিরেও তাকালো না। শুধু উত্তরহীন প্রশ্নটুকু হারিয়ে গেল বাতাসে। সে সহজ হতে চাইলো।

'তুমি কাঁদছো?'

ও মাথা নাড়লো। একটি কথাও বললো না।

মিথ্যে বললো কেন ! সে আরো কাছে সরে এলো। এখন হাত বাড়ালেই মেয়েটিকে স্পর্শ করা যায় এত কাছে। ভাবলো এবার কি বলবে।

চকিতে ও চোখ মেলে তাকালো। তার দিকে প্রসারিত ওর কালো চোখ দুটোয় কি ভীষণ অজানা একটা ভয়। আতঙ্ক ! ওর প্রত্যাখানের ভঙ্গিতে সে লজ্জা পেলো। ফিরিয়ে নিলো দৃষ্টি। না, প্রথম দেখায় মেয়েটি তাকে মুগ্ধ করতে পারেনি। বরং সে দেখলো ওর প্রশস্থ মুখ, রোদে পোড়া তামাটে দাগ, মনে মনে ভাবলো আচ্ছা ঘ্যানঘ্যানে আদুরে মেয়ে তো। তারপর সে মাথা তুলে আকাশের তারা দেখলো। ভান করলো উদাসীনতার। অথচ উঠে চলে যেতেও পারলো না। অস্বস্তিকর একরাশ নীরবতার মধ্যে দুজনেই চুপচাপ বসে রইলো। তার মনে হলো কি বলবে ভাবতে গেলে এক যুগ কেটে যাবে।

'তোমার জন্যে আমি কি কিছু করতে পারি ?'

'না। আমার জন্যে কিচ্ছু ভাবতে হবে না। আমি শুধু একটু একা থাকতে চাই।'

'আমি শুধু, মানে…তুমি কাঁদছিলে তাই—'

অসংলগ্ন বেধে যাওয়া নিজের কণ্ঠস্বর মনে হলো যেন অন্য কারুর কণ্ঠের প্রতিধ্বনি। লজ্জায় সে থেমে গেলো। তাহলে, এরপর ? হারিয়ে গেল তার আত্মবিশ্বাস। তাছাড়া, স্কুলে যাদের দেখে অভ্যস্ত, তারা ছাড়া অন্য কোন মেয়ের সাথে সে যখন স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারে না, তখন তার উঠে পড়াই ভাল। তবু…

এগিয়ে চললো সময়। বিব্রতভাবে সে ঘড়ির দিকে তাকালো। নটা বেজে গেছে। ছবি শুরু হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। শহরে নেমেছে বসন্ত গোধূলির তরল অন্ধকার। আর একবার সে মেয়েটির দিকে তাকালো। তখনো ও নিঃশব্দে কাঁদছে। গলা মোমের মতো ঝরে ঝরে পড়ছে অশ্রু। এবার স্থির সংকল্পে সে ওর দিকে ঝুঁকে এলো।

চকিতে নিজেকে ও গুটিয়ে নিলো, যেন এখনি চলে যাবে।

'যাও, চলে যাও এখান থেকে !'

'কেন ? আমি তো…'

'না। আমাকে একটু একা থাকতে দাও। শুনতে পাচ্ছো না ?'

'বেশ, তুমি যখন চাও না। তাছাড়া এ তোমার একান্ত ব্যক্তিগত…'

মনে মনে ভাবলো, আচ্ছা বোকা মেয়েতো। প্রেমিক বন্ধু হয়তো কথা

রাখেনি, তাই এখন পার্কের অন্ধকারে বসে কাঁদছে। হয়তো আত্মহত্যার কথা ভাবছে। কিংবা অন্যকোন মেয়ের মতো তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে। কিন্তু তাতে আমার কি ? আমি তো এ খেলায় মাতিনি। বেশ, বিদায় তন্বী। কোন ছেলের সাথে যখন শোভনভাবে কথা বলতে পারো না, তখন তোমার যা ইচ্ছে করো। আমি না থাকলেও তোমার দর্শকের কোন অভাব এখানে হবে না।

শিথিল স্নায়ুগুলোকে টানটান করে মেলে দেওয়ার জন্যে সে আর একটা সিগারেট বের করলো। সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে সিগারেটটা দুঠোঁটের মাঝে রেখে দেশলাই খুঁজলো। চকিতে স্থির সংকল্পে সে উঠে দাঁড়ালো। রূঢ় আচরণে বুঝিতে দিতে চাইলো ও যা ভাবছে, সে তা নয়।

ভয়ে ও চমকে উঠলো। আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে চকিতে উঠে দাঁড়ালো তার সামনে। বুকের কাছে আঁকড়ে ধরা ছোট্ট সুটকেশটা হাত থেকে পড়ে গেলো নিচে।

ওর অহেতুক ভয় দেখে তার হাসি পেলো। ভাবলো এবার বিজয়ীর মতো মাথা উঁচু করে চলে যাবে। ওকে একটু অপমান করতে তার ভীষণ ইচ্ছে হলো। কিন্তু দেশলাই এর কাঠিটা জ্বালতেই সে নিশ্চল স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইলো। বিস্ময়ে কেঁপে উঠলো তার চোখের পাতা।

মুখোমুখি দাঁড়ানো মেয়েটির দেহে প্রতিফলিত এক টুকরো আলোয় সে দেখতো পেলো ওর কোটে সূচের কাজকরা হলুদ একটা তারা, মাঝখানে কালো অক্ষরে লেখা : ইহুদী।

২

রুদ্ধশ্বাস, বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে এলো তার কণ্ঠস্বর।

'তুমি কি...'

থেমে গেল সে। একরাশ অবাক বিস্ময়ে বুঝি সিগারেট ধরাতেও ভুলে গেল। কাঠিটা পুড়তে পুড়তে যখন শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছলো, ছুঁড়ে ফেলে দিলো। অপলক চোখে ওরা দুজন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, নিস্তব্ধ নির্বাক। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় শুধু প্রকম্পিত দুটি ছায়া।

প্রায় প্রত্যাখানের ভঙ্গিতে মেয়েটি মাথা নাড়লো।

'এই, কি ব্যাপার! তুমি কি ভয় পেয়েছো?

'ভয়! কেন?'

বেঞ্চের ওপর সে ওর সুটকেশটা তুলে রাখলো। বিস্ময়ের রেশ কাটিয়ে কিছুটা সময় হাতে পাওয়ার জন্যেই সে তা করলো। আর মেয়েটি সুটকেশটা দুহাতে জড়িয়ে আবার বসে পড়লো।

সে বসলো ওর পাশে। শুকনো হাতের তালুতে মুখ ঘসলো।

সুটকেশটা রইলো ওদের দুজনের মাঝে।

'আমার মনে হয় তুমি ভয় পেয়েছো।'

'কেন—' দুলে উঠলো ওর উদ্ধত গ্রীবা। 'তুমি কি কিছুই শোননি, বাড়িতে কিংবা স্কুলে? তোমার কি মনে হয় আমাদের মতো মানুষের সাথে মেশা উচিত? বলো, চুপ করে রইলে কেন?'

সে কোন কথাই বললো না। পাশ থেকে শুধু শুনলো ওর গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস। ও এখন আকাশের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে, অনেকটা শান্ত। আর সে, হাঁটুতে কনুই রেখে নিঃশব্দে ভেবে চললো। একটুও নড়লো না, যতক্ষণ না আবার শুনতে পেলো ওর কোমল কণ্ঠস্বর।

'আগে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতে পারতাম। ছোটবেলায় প্রায়ই অসুখের ভান করতাম, যাতে না স্কুল যেতে হয়। অঙ্কে আমার ভীষণ ভয় করতো। একটুও পারতাম না। এখন আর ভয় করি না। তাছাড়া এখন আর আমাকে কোথাও যেতে হয় না, এমন কি সিনেমাতেও না...'

অন্যমনে তার হাতটা এসে পৌঁছলো পকেটে, যেখানে টিকিটটা রয়েছে। তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিলো। তাছাড়া এখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। এতক্ষণ

মনে ছিলো না ভেবে সে স্বস্তি পেলো।

'…হয়তো এখানে এই পার্কে আসাটা আমার উচিত হয়নি, ইচ্ছে থাকলেও না। অবশ্য এখন আর কিছুই এসে যায় না। যাইহোক আমার সম্পর্কে শুনলে তো সব, এখন যেতে পারো।'

'আর তুমি ?'

'আমি ?'

'হ্যাঁ, বাড়ি যাবে না ?'

'না।'

'কেন ?'

'যেহেতু আমি বাড়ি যেতে চাইনা—' উদ্ধত ভাবে ও বললো। 'কেন তুমি এসব জানতে চাইছো ? আমার জন্যে কিচ্ছু ভাবতে হবে না। আজ আমি ঘৃণ্য অপাংতেও।'

'না না, ওভাবে বলোনা' —সে ওকে বাধা দিলো। 'এ আমি কল্পনাই করতে পারি না।'

লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠলো ওর সারা মুখ। 'দোহাই তোমার, আর কিছু জিগেস করো না—' এখন আরো কোমল ওর কণ্ঠস্বর। 'হয়তো তুমি আমাকে এখুনি পুলিশে ধরিয়ে দেবে।' হঠাৎ এক ঝলক হিমেল বাতাসে ও কেঁপে উঠলো। দুহাতে কোটাটা টেনে দিলো বুকের কাছে।

'শীত পড়েছে, ঠাণ্ডা লাগতে পারে। বাড়ি যাচ্ছো না কেন ?'

'যেহেতু আমিও এখন বাড়ি ফিরতে চাই না' —রুক্ষ তার কণ্ঠস্বর। 'তাছাড়া, আমি তো আর কচি খোকা নই।'

ওদের টুকরো টুকরো কথার মাঝে উঠে এলো একরাশ নিতল নিস্তব্ধতা। চাপচাপ অন্ধকার ওদের সম্পূর্ণ ঢেকে দিলো। পার্কের চারিদিকে বাড়িগুলোর দেওয়ালে কোথাও এতটুকু আলো নেই, যেন অরণ্য প্রাচীর। ব্ল্যাকআউটের কালো পর্দায় জানলাগুলো ঢাকা। ভেতরে মানুষের উষ্ণ স্পন্দন। অন্ধকার ! ঝোপের ওপারে জলন্ত সিগারেটের ছোট্ট একটুকরো আলো, হয়তো কেউ পথটা পেরিয়ে যাচ্ছে। আলোটা মিলিয়ে যেতেই ওরা আবার চাইলো অসংলগ্ন কথার সূত্র বাধতে।

'তুমি ভেবেছো, আমি তোমায় পুলিশে ধরিয়ে দেবো, তাই না ?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'মোটেই না। অমি খুব সাধারণ, এমনি পার্কে বসেছিলাম। দেখ সিনেমার টিকিট রয়েছে পকেটে—'

'তাহলে আমার জন্যেই—' আহত কণ্ঠস্বরে ও বাধা দিলো।

'না না, ঠিক তা নয়, ও জন্যে তুমি কিছু ভেবো না। এমনি, আজই থিওরী-টিক্যাল পরীক্ষা সব শেষ হলো, তাই...'

'আমিও এবার ফাইনাল পরীক্ষা দিতাম। ক্লাশে ওঠার পাঁচমাস পরেই ওরা আমাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিলো।'

'বিশ্বাস করো, সত্যিই আমি দুঃখিত।'

'হয়তো তাই। তবু আমরা পরস্পরে দুঃখ প্রকাশ করতে পারি না।'

নিঃশব্দে সে মাথা নাড়লো। ভাবলো এবার কি বলবে। নিশ্চয়ই এখন সে 'শুভরাত্রি' বলে উঠে চলে যেতে পারে না। তাছাড়া ওর সান্নিধ্যে নিজেকে এখন অনেকটা সহজ স্বচ্ছ মনে হচ্ছে। সুটকেশটার দিকে তাকালো 'কি আছে এতে?'

'আমার যাকিছু সব। জামাকাপড়, টুথব্রাস, বই, দু একটা টুকিটাকি। ওরা এর বেশী আনতে দেয় না, অবশ্য এছাড়া আমার আর কিছু নেইও।'

সে কিছুই বুঝতে পারলো না। 'আনতে দেয় না কেন?'

ও তাকে বুঝিয়ে দিলো, ভাঙা ভাঙা স্খলিত কয়েকটি শব্দের দ্রুত স্পন্দনে, যেন আহত উত্তেজনায় হারিয়ে যাওয়া অসংখ্য কথার একটি মালা। তবু ওর কথার মূল সুরটুকু সে ধরতে পারলো। প্রাগের কাছে ছোট্ট একটা শহরে ওরা থাকতো। বাবা ছিলেন ডাক্তার। তারপর জার্মানরা এলো। ভাই ছিলো সবার বড়। পুবে না পশ্চিমে, কোথায় যেন সে চলে গেল, কেউ জানলো না। গত বছর আত্মীয়স্বজনদের সাথে ওরা প্রাগেই কাটিয়েছে। পিসিমা বিয়ে করেছিলেন কোন আর্যকে। মাঝে মাঝে প্রায়ই ওদের বিচ্ছেদ হতো। এ এক ধরণের প্রব-ঞ্চনা। তাই বাবামনি মাকে নিয়ে ওখান থেকে চলে গিয়েছিলেন টেরাঝিনে। ওঁরা গিয়েছিলেন গত নভেম্বরে। এই তিন মাস ও একটিও চিঠি পায়নি। তার কি মনে হয়, ওঁরা ওখানে নেই? নইলে চিঠি দিলেন না কেন? নির্বাক চোখের পাতায় কি অজস্র ব্যাকুলতা। কেন, কেন?

অসহায়ের মতো সে কাঁধ ঝাঁকালো। এসব ব্যাপার সে কিছুই জানে না। হয়তো ওঁদের সম্পর্কে এখনো সে কিছুই ভেবে উঠতে পারেনি। তারপর কি

হলো ? তারপর এলো ওর পালা। কয়েকদিন আগে টেরাঝিনে যাওয়ার জন্য ওকে 'পরিচয় পত্র' দেওয়া হয়েছিলো, এখনো সেটা পকেটে। বলা হয়েছিলো নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট ট্রান্সপোর্ট অফিসে এসে দেখা না করলে চরম শাস্তি দেওয়া হবে। ব্যাস, তারপর সব শেষ।

'কবে তোমার যাওয়ার কথা ছিলো ?' শান্ত স্বরে সে জিগেস করলো।

'আজই ভোরে...'

হিমেল বিস্ময়ে কেঁপে উঠলো তার সারা শরীর।

'যেখানে যাওয়ার কথা ছিলো যাও নি ?'

'না।'

সে কিছুই বললো না। শুধু শোনা গেল একটা অস্ফুট ধ্বনি। কি বলবে সে। ওরা যখন এই পার্কে বসে কথা বলছে, তারা হয়তো তখন শিকারী হায়নার মতো ওকে খুঁজে ফিরছে। চামড়ার লম্বা কালো কোট, চোখের ওপর পর্যন্ত টানা লোহার হেলমেট। আশ্চর্য ! ও যেন ছুটে গেছে সিঁড়ির ধারে, ওর ঘর, যেখানে ও ওর বাবা মার সাথে বাস করতো। সে যেন স্পষ্ট অনুভব করতে পারলো সেই হিমেল নিস্তব্ধতা, সারা বাড়ি জুড়ে মৃত্যুর নগ্ন উল্লাস। দরজা খোল। তারপরেই দরজায় একঝাঁক গুলির শব্দ !

আর এখন ও এখানে বসে।

ওর কান্নার শব্দে সে আবার তার ভাবনার অতল থেকে চোখ মেললো। দেখলো দুহাতের স্তব্ধ করপুটে লুকনো ওর মুখ, কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে সারা শরীর। এই প্রথম সে ওর কাঁধদুটো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে নাড়া দিলো। ও বাধা দিলো না এতটুকু।

বলো বলো, কথা বলো ! নিজেকে কেমন যেন অসহায় মনে হলো।

সে ওকে মৃদু নাড়া দিলো।

'এই, কেঁদোনা, শোন। আমি বলছি কিছু হয়নি !'

'কেন যে যাইনি আমি নিজেই জানিনা'—কান্নার মাঝে ওর কণ্ঠস্বর আর্তনাদের মতো মনে হলো। 'বিশ্বাস করো, আমার ভয় হচ্ছিলো, ওঁরা বোধহয় ওখানে নেই, নইলে চিঠি দিলেন না কেন ? তারা বোধহয় ওঁদের কোথাও নিয়ে গেছে। সবাই বলছিলো···সে যাকগে, আমি তো আর পশু নই যে যখন যেখানে খুশী আমাকে পাঠিয়ে দেবে। তাছাড়া আমি তো আর কোন অন্যায় করিনি···'

সহসা সমস্ত শক্তি দিয়ে সে ওকে শান্ত করার চেষ্টা করলো। বুকের মধ্যে থেকে অশুভ একটা শীতলতা কাঁপিয়ে গেল তার সমস্ত সত্তা। কেবল অন্ধকারে জ্বলে উঠলো তার চোখদুটো।

'সবাই বলে ওরা আমাদের বাগানে কাজ করার জন্যে নিয়ে যায়। আমি তাতে ভয় পাইনা, গাছ আমার খুব ভালো লাগে। আমি আর ব্লাঙ্কা, আমার বান্ধবী, আমরা দুজনে সারাদিন বাগানে গল্প করতাম, গাছে জল দিতাম। ওকে ধরে নিয়ে যাবার আগে ও প্রতিজ্ঞা করেছিলো চিঠি লিখবে, লিখেছে··· দেখনা, দেখবে? তুমি হয়তো ভাবছো আমি একটা ভীরু, তাই না? কিন্তু আমি চাইনা, তাছাড়া আমি জানি যখনি ওদের কবলে পডবো, উঃ ভবাতেও গা আমার ছমছম করছে। হয়তো এ সত্যি নয়, হয়তো ভয় পেয়েছি বলেই ভাবছি। সত্যি এ রকম দুঃসাহসিকতার কোন মানে হয় না, তাই না? দোহাই তোমার, এমন চুপ করে থেকো না, কিছু বলো?'

কি বলবে সে, বুকের মধ্যে তখন তার রক্ত জমাট। তবু ক্রুদ্ধ উন্মত্ততায় সত্তার অতল গভীর থেকে কাঁপা কাঁপা যে শব্দগুলো দ্রুত উঠে এলো, নিজের কানেও বুঝি সে বিশ্বাস করতে পারলো না এ তারই কণ্ঠস্বর।

'তুমি ঠিক করেছো।'

'তোমার বুঝি তাই মনে হয়!'

'এখন ওসব কিছু ভেবোনা। লক্ষ্মীটি শোন, কেঁদো না।'

'কেন যে তোমাকে বলতে গেলাম, এ আমার একান্ত ব্যক্তিগত। জানিনা তুমি ঠিক কিভাবে নেবে। তাছাডা, তোমার সম্পর্কে কিছুই জানি না। এখন কি হবে?'

কি বলবে সে ভেবেই পেলো না। কেমন যেন একটা ক্লান্ত অনুভূতি, যেন উপপ্লব এই উত্তাল আবেগের বন্যায় সে কত ভঙ্গুর। সিগারেট খেতেও এখন আর ভালো লাগছে না। মাথার মধ্যে এলোমেলো চিন্তার স্রোতগুলি একই আবর্তে পাকখেয়ে ফিরছে, কিছুতেই শান্ত করতে পারছে না। এবার কি তার চলে যাওয়া উচিত? কিন্তু ওকে এখানে একা ফেলে সে কিছুতেই চলে যেতে পারবে না। সে তা চায়ও না, তাহলে? কিছুক্ষণ চুপচাপ বসন্তের ধূসর অন্ধকারের দিকে অপলক চোখে সে তাকিয়ে রইলো। অদূরে কয়েকটি প্রণয়ীযুগল। অন্ধকারেও সে স্পষ্ট দেখতে পেলো তাদের দেহরেখা, সিগারেটের টিপটিপ আলো। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সে অনুভব করলো হিমেল বাতাসে ও

কাঁপছে। ছোট্ট সুটকেশটা তখনো ওর দুহাতের নিবিড়তায় জড়ানো। ভাবনার দুরন্ত আবেগে সে ঠোঁটদুটো চেপে ধরলো।

চকিতে একটা পরিকল্পনা তার মাথায় দ্রুত খেলে গেল। পাগলের মতো এমন আশ্চর্য কল্পনা এর আগে সে কখনো করেনি। অথচ ভাববারও কোন অবকাশ ছিলো না। এ যেন পরিণত কোন মানুষের ভাবনা। এমনি সহজ, যেন তাকে স্বপ্নাবিষ্ট করে তুললো।

দৃঢ় সংকল্পের ভঙ্গিতে সে সিগারেটটা ধরিয়ে নিলো। দেশলাইএর কাঠির আলোয় মিলিয়ে গেল সামনের অন্ধকার, প্রতিফলিত হলো পায়ের নিচের সবুজ ঘাস। তারপর সে উঠে দাঁড়ালো। নিশ্চল প্রতিমূর্তি মেয়েটির পাশ থেকে বাঁ হাতে সে সুটকেশটা তুলে নিলো, ডান হাতে মৃদু স্পর্শ করলো ওর কাঁধ। সাহায্য করলো ওকে উঠে দাঁড়াতে।

'ভয় পেওনা, এসো আমার সঙ্গে। দেখো কোন অসুবিধে হবে না।'

তারপর এ রাস্তা ও রাস্তা থেকে অন্য রাস্তায়, যদিও খুব কাছেই—ঐতো গলির মোড়টা। সারি সারি বন্ধ দোর, অন্ধকার গলির মধ্যে দিয়ে ওরা হেঁটে চললো। ডান হাতটা ওর কাঁধে, আর প্রতিবাদহীন নিঃশব্দ ও হেঁটে চলেছে পাশাপাশি। দেওয়ালের গায়ে রাস্তার আলোর অস্পষ্ট নীল রেখা। জানলাগুলো অন্ধকারে মোড়া। এ পথ তার আশ্চর্য চেনা, যেন চোখ বন্ধ করে এখুনি সে ছুটে যেতে পারে। এ পথে সে কতবার একা একা হেঁটে গেছে, আর এখন তার পাশে নিশ্চুপ নাম না জানা একটি মেয়ে। মাঝে মাঝে দু'একটা মানুষের অস্পষ্ট ছায়া, বড় রাস্তায় মোটরের হর্ন, ট্রামের ঠুংঠাং শব্দ।

মাথার ওপরে স্বচ্ছ কয়েকটি তারা।

এই আমরা এসে গেছি। সাবধানে এসো। হাত ধরে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে ওকে দোতলার বারান্দায় নিয়ে এলো। চাবি দিয়ে দরজা খোলার মৃদু শব্দ। তারপর অন্ধকার। ঘরের ভেতরে বন্ধ হাওয়ায় তামাকের গন্ধ।

সে ভাবলো হয়তো আমাদের কেউ দেখতে পায়নি। হয়তো। এই, আলো জ্বেলো না। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে এসে সে বন্ধ জানলাটা একটু খুলে দিলো। আর সাথে সাথেই ভেতরে লাফিয়ে ঢুকে পড়লো এক ঝলক মিষ্টি বাতাস। তারপর মোম লাগানো কালো কাগজ দিয়ে জানলাটা এঁটে দিলো। দেখলো বাঁ দিকের কোণে একটু ছেঁড়া দিয়ে অস্পষ্ট আলো আসছে। সেটা বন্ধ করে, টেবিল ল্যাম্পের ছোট্ট আলোটা জ্বেলে দিলো।

কম পাওয়ারের অল্প আলোতেও ছোট্ট ঘরটা ভরে গেল।

নবাগতার দিকে সে ফিরে তাকালো। দরজার সামনে নিশ্চল প্রতিমূর্তির মতো তখনো ও দাঁড়িয়ে। হঠাৎ আলোয় ধাঁধানো ওর উৎকণ্ঠিত চোখ দুটি চার দেওয়ালের নগ্নতায় কি যেন খুঁজছে। এ আমি কোথায় এলাম। কেন আমায় এখানে আনলে ? তোমাকে তো চিনতে পারছি না। কি চাও তুমি ? সে যেন স্পষ্ট অনুভব করতে পারলো ওর নিবিড় কালো দুটি চোখের স্তব্ধ ভাষা।

'মনে করো এ তোমার নিজের ঘর। এখানেই তুমি থাকবে।

উত্তেজনাহীন ব্যাকুল আগ্রহে সে যখন ভাঙা চেয়ারটায় বসলো, জীর্ণ চেয়ারটা দুলে উঠলো তার ভারে। আর ওর দিকে তাকিয়ে দুষ্টুমি করে হাসতে দেখে মেয়েটি যেন সাহস পেলো। বসে পড়লো সোফার এক প্রান্তে। তখনো একটুকরো আতঙ্ক জড়িয়ে রয়েছে ওর সারা দেহে। এ যেন স্বপ্ন, সত্যি নয়! তবু মুক্তির গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস হারিয়ে গেল ঘরের থমথমে স্তব্ধ বাতাসে। নিজের চারিদিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখলো। কৌতূহলী হাতে স্পর্শ করলো জীর্ণ স্প্রিংগুলো। লজ্জাবনত চোখের পাতায় ফুটে উঠলো একটুকরো ম্লান হাসি।

'ঘরটা কিন্তু বেশ সুন্দর।'

'মোটেই সুন্দর নয়। তবে এখানে তোমার কোন ভয় নেই, কেউ আসবে না। আমার নাম পল।'

'আমার নাম এস্টার।'

'অদ্ভুত নাম তো !'

'বাবামনির কাণ্ড। তোমার হয়তো শুনতে ভালো লাগছে না।'

'আমি কি বলেছি ভালো লাগছে না ? কোনদিন শুনিনি তাই।'

উঠে পড়ে সে পায়চারি করতে লাগলো। ভাবলো কি কি প্রয়োজনীয় কথা ওকে বলবে। উলের কম্বলটা আনতে হবে। জলতো আছেই। কাপবোর্ডের সাথে কোট রাখার হ্যাঙার। এটা যে এখানে ছিলো আগে তো জানতাম না! এই দরজাটা দোকানের দিকে, দিনের বেলায় কখনো ভুলেও খুলো না। সারাদিন চুপটি করে থাকবে, বুঝলে। পাশের ঘরে লোকেরা কাজ করে। দরজার বাইরে ওয়াসবেসিন আর বাথরুম। দিনের বেলায় কিংবা রাত্তিরে যখনি যাই হোক না কেন, কক্ষোনো বারান্দায় যাবে না। আর ভুলেও রেডিও খুলবে না। না, আগে প্রতিজ্ঞা করো। আলো জ্বালার আগে মনে রেখো এটা

ব্ল্যাকআউটের রাত। তাছাড়া আলো জ্বাললে উঠোন থেকেই তোমাকে এখানে স্পষ্ট দেখা যাবে। আর শোন, ভুলে না যাওয়া পর্যন্ত তুমি…

লজ্জায় ঘেমে উঠলো হাতের তালু। সামনের চেয়ারে বসে অপলক বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো। এখন ওর সবটুকু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, মনে হচ্ছে কি আশ্চর্য সুন্দর। কাকের ডানার মতো কালো চুলের নিচে ওর বিবর্ণ মুখ। মুখের রেখা ওর খুব স্বাভাবিক নয়, তবু স্বল্প অস্বাভাবিকতায় কেমন যেন আশ্চর্য মোহময়। চোখের কোণ থেকে বাঁকা ভ্রূর প্রান্ত পর্যন্ত কালো রাত্রির অন্ধকার একটি রেখা এসে মিশেছে ওর ঘন কালো চুলের নিচে। অবাক বিস্ময় ভরা সুন্দর দুটি চোখ। হলুদ তারা আঁকা সাদা ব্লাউজের নিচে নিটোল স্তনরেখা। মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো, চকিতে সরিয়ে নিলো দৃষ্টি। কিছুতেই বুঝতে পারলো না গন্ধটা কিসের—সাবানের, সেন্টের, ঘামের, না অবিন্যস্ত চুলের!

জোর করেই সে ওর দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে হাসলো।

'এখানে তোমার ভয় করছে?'

'না। একটুও না।'

ও মাথা নাড়লো, চোখে চোখ পড়তেই নামিয়ে নিল চোখের পাতা।

পল উঠে পড়লো। ঘড়িতে দেখলো সাড়ে দশটা। সর্বনাশ! এখুনি যেতে হবে। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

'তুমি আবার আসবে?' অস্ফুট ওর কণ্ঠস্বর। অনেকক্ষণ অপলক চোখে ও তাকিয়ে রইলো পলের মুখের দিকে।

পল এসে দাঁড়ালো ওর সামনে। পৌরুষের বিজয় উন্মাদনাটুকু সে অনুভব করলো তার উষ্ণ রক্তস্রোতে। এই মুহূর্তে মনে হলো এ পৃথিবীর কোন কিছুই আর তাকে ক্লান্ত করতে পারবে না।

'নিশ্চয়ই, আমি আবার আসবো'—আশ্চর্য স্বরে সে বললো, 'তুমি দেখো, কালই। এখানে তোমার ভয় পাবার কোন কারণ নেই, দেখো কোন অসুবিধে হবে না। তাছাড়া আজ থেকে আমরা দুজনে যে বন্ধু এস্টার, তাই না?'

বাতাসের মতো দ্রুত পায়ে সে নেমে এলো অন্ধকার রাস্তায়। ছুটে যেতে যেতে ভাবলো বাড়ির সবাই হয়তো এখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুমননি কেউই। রান্নাঘরের টেবিলের দুদিকে দুজনে বসে। বাবা অপলক চোখে তাকিয়ে আছেন কাপবোর্ডে রাখা বড় অ্যালার্ম ঘড়িটার দিকে। মার দুচোখ কান্নায়

ভেজা। ওঁদের সামনে চোখ ধাঁধানো আলোয় নিজেকে তার কেমন যেন অপরাধীর মতো মনে হলো। স্টোভের সামনে এসে কেটলির ঢাকনাটা খুলে ফেললো। যদিও একটু ঠাণ্ডা কফিই খুঁজছিলো, তবু তার খেতে ইচ্ছে হলো না। অসহ্য নিস্তব্ধতার মাঝে ঘড়িটা হঠাৎ বেয়াড়া ভাবে বেজে উঠলো।

'বাড়ি ফেরার এইটে কি সময়' বাবাই প্রথম কথা বললেন, 'বলে যাওয়ার কি কিছু প্রয়োজন বোধ করো না? তুমি জানো, সেই কখন থেকে তোমার মা আর আমি বসে বসে ভাবছি।'

নিস্পলক দৃষ্টি মেলে সে কাঁধদুটো ঝাঁকিয়ে তুললো।

'আমি তো আর ছেলেমানুষ নই'—ছোট্ট একটা ভীরু প্রতিবাদ।

মা হাতে হাত ঘসলেন। বিরক্তিতে তাঁর চিবুকদুটো কেঁপে উঠলো।

'আমি তো বলে গেলাম সিনেমায় যাচ্ছি। পরীক্ষার পর ভীষণ মাথা ধরেছিলো, তাই। তাছাড়া আমি আর বার্ট, রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প করতে করতে দেরি হয়ে গেল...'

'তুমি আর বার্ট!' বিস্ময়ে জমাট বাবার কণ্ঠস্বর। ভ্রুদুটো তাঁর কুঁচকে উঠলো।

বাবার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি লক্ষ্য করে ও পায়ে পা খুঁটলো। বাবা উঠে দাঁড়ালেন, বয়সের ভারে জীর্ণ, আনত। ছেলের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে তিনি একটি কথাও বললেন না। তাঁর এই নিটোল নিস্তব্ধতার চেয়ে অনেক ভালো তিনি যদি পলকে মারতেন। বৃদ্ধ সন্তর্পনে চশমাটা খুলে খাপে ভরে রাখলেন। খবরের কাগজটা ভাঁজ করে কাপবোর্ডের নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে দিলেন। তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন।

'আমার ধারণা ছিলো তুমি কখনো...কথা বলো না, আমাকে বলতে দাও। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো সময়টা এখন ভালো নয়। আর তাছাড়া তুমিও এমন একটা বড় কিছু হয়ে ওঠোনি। ভেবে দেখ, এখন এগারোটা। অবশ্য অমি জিগেস করবো না এতক্ষণ কোথায় ছিলে, কেননা আমি জানি তুমি মিথ্যেই বলবে। হ্যাঁ, মিথ্যে...'

কেমন করে উনি জানলেন। মনে মনে ভাবলো কি বলবে সে? বলবে যা সত্যি? উনি কি ভাববেন? ভাববেন আমি পাগল হয়ে গেছি। ঠিক তাই। চেয়ে এর ভালো চুপ করে থাকা, যা হয় কাল হবে। একরাশ তিক্ততার মধ্যেও সে যেন মুক্তি পেলো।

'কেন, কিছু হয়েছে ?' ভয়ে ভয়ে সে জিগেস করলো।

'হবে আবার কি ? সন্ধ্যেবেলায় বার্ট তোমাকে খুঁজতে এসেছিলো।'

মিথ্যের সাথে আর একটা মিথ্যে ছাড়া আর কিইবা বলার আছে।

দাঁতে দাঁত চেপে সে চোখ নামিয়ে নিলো। কিছু বললো না।

সেই রাত্রে বিছানায় শুয়ে সে ঘুমোবার চেষ্টা করলো, পারলো না। সন্ধ্যে থেকে ঘটে যাওয়া একরাশ চিন্তার ঢেউ যেন একসাথে আছড়ে পড়ছে। অজানা একটা ভয়, বিস্ময় আর বিজয়ীর উন্মাদ আনন্দ। তবু ওর জন্যে সে কিছু করতে পেরেছে। এস্টার! কি আশ্চর্য একটা নাম। হয়তো সত্যিই সে ওর জীবন রক্ষা করতে পেরেছে। নিশ্চয়ই, নইলে ও কোথায় যেতো। মাথার নিচে দুহাত রেখে অপলক চোখে ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলো। অনেকক্ষণ ধরে ওর বিবর্ণ মুখ, নিবিড় কালো চোখদুটো ভাবার চেষ্টা করলো। অজানা উত্তেজনায় ঘুম তার উধাও। তবু তাকে ঘুমতে হবে। ভোরে সূর্য ওঠার আগেই সে ছুটে যাবে ওর কাছে।

ভোর! ভোরের সূর্য ওঠার আগেই!

সেইদিন, ১৯৪২ সালের ২৭শে মে। সকাল থেকেই রাস্তার সবকটি লাউড-স্পীকারে ঘোষণা করতে শোনা গেল রক্ষণাধীন সমগ্র ইহুদীদের ওপর নাৎসী আক্রমন। ব্যক্তিত্বহীন রুক্ষ একটা যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর লাউডস্পীকার থেকে ছড়িয়ে পড়ছে শহরের অলিতে গলিতে, দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে স্তব্ধ বাতাসে।

সামনের গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে সে রুদ্ধশ্বাসে শুনলো। প্রথমে প্রচণ্ড শব্দে কিছুই বুঝতে পারেনি। অনেকেই ভিড় করে দাঁড়িয়েছিলো। সবার চোখে শুধু একটিই প্রশ্ন—ব্যাপারটা কি ?

...অপরাধীদের ধরিয়ে দেওয়ার মূল্য দশ সহস্র ক্রাউন। সামরিক নিরা-পত্তার জন্যে...ওবারল্যাণ্ডরাটে...রাত্রি নটার পর জনসাধারণের চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, এমন কি ঐ সময়ে রাস্তায় কাউকে দেখা গেলে গুলি করা হবে...

ঘোষণা বিরতির সাথে সাথেই আবার চারিদিক জুড়ে নেমে এলো এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। রাজপথে ট্রামের ঠুং ঠাং শব্দ, ব্রেক কষার নগ্ন প্রতিবাদ। তারপর আবার সেই যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর।

৩

'ওরে ব্বাবা, এটা আবার কি!' ঝুঁকে পড়লো ওস্তাগর চিপেক। দুপুর গড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ। চেয়ারে বসে হাঁটুর ওপর থালা রেখে গোগ্রাসে সে গিলছে। চশমার ভেতর দিয়ে ঘোলাটে চোখদুটো তার থালার দিকে নিবদ্ধ। প্রতি গ্রাসে একবার করে তরল বিয়ারে গলটা ভিজিয়ে নিচ্ছে। এ দোকানের সবাই জানে তার প্রকৃতি। তাই পারতপক্ষে কেউ তাকে ঘাঁটায় না বা তার কথায় প্রতিবাদ করে না।

'বলা শক্ত'—শোনা গেল দর্জির অস্ফুট কণ্ঠস্বর। উদ্বিগ্ন চোখদুটো তাঁর দ্রুত ঘুরে চলেছে দোকানের চারিদিকে। ওদের পেছনে শিক্ষানবীশ ছেলেটা ধুলো ঝাড়ছে। আর পল। জানালার সামনে বসে রাস্তার দিকে অপলক চোখে সে তাকিয়ে আছে। টেবিল থেকে ফিতেটা ঝুলছে। রোদ সরে গেছে বাড়ির এক দেওয়াল থেকে অন্য দেওয়ালে।

সমর্থনের ভঙ্গিতে দর্জি ওকে শান্ত করতে চাইলেন। বেচারী চিপেক! চিরদিনই সে মুখের ওপর স্পষ্ট কথা বলে। ওকে তিনি খুব ভালো করেই জানেন। কয়েক বছর ধরে ওঁরা একসাথে এই দর্জির কাজ করেছেন, সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে। ওর মৌলিক ধারণাগুলির সাথে দর্জি পরিচিত। তাই ওর কথায় কোনদিন আঘাত পেতেন না। পরস্পরে ও'রা সেই পুরনো দিনের বন্ধু। এখন আর নিজে কাপড় না কেটে দোকানের সম্পূর্ণ ভার ছেড়ে দিয়েছেন চিপেকের ওপর, সেই যা খুশী বলে—তুমি কিন্তু আজকাল দোকানের দিকে একটুও নজর দিচ্ছো না। সত্যিই, আজ আর তিনি তরুন নন, বৃদ্ধ। ব্যবসায়ের উচ্চাকাঙ্খা যদি কোনদিন কিছু থেকে থাকে, বহু আগেই তা শেষ হয়ে গেছে। তবু, এখনো সংসার আছে, তার কথা ভাবতে হয়। পল আছে, তাকে মানুষ করতে হবে। মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া উপায় কি। বরং এ পৃথিবীতে চিপেকই নিঃসঙ্গ। সারাটা সন্ধ্যে সে শয়তানের সাথে মদ আর তাস খেলে কাটিয়ে দেয়। ডবল্! রিডবল্! তুরুপ বাজি রাখো—তুমি হেরে গেছো!

'একটা নেকড়ে মারার অর্থ এই নয় যে নেকড়ের পাল থেকে তুমি মুক্তি পেলে, বুঝলে'—ঝাঁঝালো চিপেকের কণ্ঠস্বর। 'কাগজের দিকে তাকিয়ে দেখ? এই তো সবে শুরু। আজকে দিনে মানুষের দিকে নোংরা দৃষ্টিতে তাকানো ছাড়া যেন আর কোন কাজ নেই। ধ্যাৎ! নাৎসীরা আবার কারুর জন্যে কিছু করবে

বলে মনে করো…' চশমার ফাঁক দিয়ে টেবিলের সামনে মেলে দেওয়া কাগজের ওপর সে চোখ বুলিয়ে চললো, আর তালুর পেছন দিয়ে রুক্ষ চিবুকে হাত ঘসলো। এটা তার চিরকালের বিশ্রী স্বভাব, দুপুরে খাবার সময় জোরে জোরে খবরের কাগজ পড়া আর মন্তব্যগুলো সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বিদ্রূপ করা। 'বেশ বাবা, বেশ! খারকভের কাছে বিরাট যুদ্ধজয়! অসংখ্য যোদ্ধা, ইয়ারম্যাচ…আমরাও সেখানে…জাপানীরা আবার…'

বাবা নিস্তব্ধতার ক্লান্তি অনুভব করলেন, চঞ্চল হয়ে উঠলেন নিজের চেয়ারে। চিপেকের স্বগতোক্তিতে কথা বলার প্রয়োজনও বোধ করলেন না। যা খুশী বলুক। ওসব বখ্‌তিয়ার খিলজিদেরই মানায়। তাছাড়া আজকাল দেওয়ালেরও কান আছে। মাঝে মাঝে ওঁর ক্লান্ত দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে ছেলের ওপর, যেখানে সে চুপচাপ বসে। চেষ্টা করলেন প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দেবার, অন্তত পুরনো খদ্দেরের শেষ না করা সেই জ্যাকেটটা সম্পর্কে কিছু বলার। কিন্তু চিপেকের জ্বালায় তা আর হবার উপায় নেই।

'আরে, এ যে দেখছি আজব ব্যাপার!' চিপেক তার আঙুলে কাগজটা তুলে ধরলো। 'দশ সহস্র ক্রাউন ··কেউ যদি এই মহিলার সন্ধান দিতে পারে, তার বাইসাইকেল টুপি আর ছোট্ট সুটকেস। জয়ি, দেখি দেখি, এদিকে একবার এসো তো…উহুঁ, নাক বেঁকাবে না। দেখি তোমার টুপিটা। হুঁ, ঠিক যা সন্দেহ করেছি তাই। যাও, এখুনি গিয়ে পুলিসের কাছে আত্মসমর্পন করে এসো। আরে আরে, এটা আবার কি…বর্তমানে কেউ যদি বিনা রেজিসট্রেসনে প্রো…প্রোটেনটোরাটে ঘুরে বেড়ান, অথবা শনিবারের মধ্যে রেজিসট্রেসন না করেন…গুলি করে মারা হবে। তাজ্জব! টেবিলের নিচেটা একবার দেখে নিই, বলা যায় না এখানেই হয়তো কোন টেরারিস্ট লুকিয়ে আছে।' বিদ্রূপের ভঙ্গিতে আড়চোখে সে দর্জির দিকে তাকালো।

'আমার মনেহয় এলোইস, তুমি আর কোন কিছুর মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে চাও না।'

'এক মিনিট একটু চুপ করে থাকতে পারো না?' বিষণ্ণ ম্লান হয়ে এলো দর্জির কণ্ঠস্বর।

'কেন, কি হয়েছে কি? এই তো কাগজে লেখা রয়েছে, দেখ না…আমি কি বানিয়ে বলছি?'

নিতল নিস্তব্ধতার মাঝে ফিতেটা হঠাৎ মেঝেতে পড়ে গেল। চকিতে

দর্জির দৃষ্টি গিয়ে পড়লো ছেলের ওপর। সামনের দিকে ঝুঁকে তখনো ও অপলক চোখে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে, যেখানে ছায়া ছায়া কয়েকটি রেখা এসে মিশেছে বাঁধানো ফুটপাথে। ওর চোখের দিকে তাকানো যায় না এত নিস্তব্ধ। 'কি হয়েছে পল, শরীর কি খারাপ?'

'কই, না তো। এমনি গরম লাগছে।'

মিথ্যে না বললে যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না, সেই অনিবার্য মিথ্যের মানসিক যন্ত্রণা যেন দুজনকেই বিব্রত করে তুললো। দুজনের মধ্যে এ যেন এক কাচের প্রাচীর, যার মধ্যে দিয়ে যাওয়া আসা যায় না, শুধু প্রশ্নগুলো টুপটাপ বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ে।

'কি হয়েছে তার তুমি জানবে কেমন করে?' বখ্‌তিয়ার চিপেকই প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙে। 'না না, ঠাট্টা নয়। যাই বলো, ফাইন্যাল পরীক্ষা দেওয়া অত সোজা নয়...'

পল উঠে দাঁড়ালো। চোখে মুখে তার এক দুর্বোধ্য যন্ত্রণা। পুরনো সেলাই মেশিন দুটোর পাশ দিয়ে দ্রুত পায়ে সে হেঁটে গেল। কি হয়েছে কিছু বুঝে ওঠার আগেই, সামনের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

পথ চলতে চলতে অজস্র প্রশ্ন একসাথে ভিড় করে এলো তার বুকের মধ্যে। আশ্চর্য, সারা দিন ওরা কি যে বকবক করে। মনে পড়লো বাবার সেই অবাক দৃষ্টির সীমানা ছাড়িয়ে সে এখন অনেক দূরে। পিচগলা পথে, লক্ষ্যহীন তীরের মতো এখন শুধু হেঁটে চলা। কিন্তু এ তাকে কোথায় নিয়ে এলো!

দোকানের সার্সীগুলো তার ভীষণ চেনা। ছেলেবেলায় এক আনায় সেই ভেনিলা আইসক্রীম কিনে খাওয়া। তখন সে খুব ছোট। মুঠোর মধ্যে যতক্ষণ না আনিটা ঘেমে উঠতো কিছুতেই সে হাত খুলতো না, উন্মুখ হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতো। সামনেই কসাইয়ের দোকান। যুদ্ধের আগে টেরিবা ওখানে কষা মাংস আর কাবাব বিক্রি করতো। রেশান কার্ড ছাড়া এখন আর এসব কিছুই পাওয়া যায় না। কসাই দোকানে বসে বসে শুধু হাই তোলে। নিচের কয়লার দোকানের সামনে নোংরা দাঁড়কাকটা ভাঙা ডানা নেড়ে কি যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। তারপর এ রাস্তা থেকে অন্য রাস্তা, এ বাড়ির দরজা থেকে অন্য বাড়ির দরজা অতিক্রম করে সে হেঁটে চললো। দেওয়ালে দুর্বোধ্য হিজি-বিজি লেখা, অশ্লীল সেই ছবি—এ সবই তার আশ্চর্য চেনা। এরই মধ্যে সে

প্রথম হাঁটতে শিখেছে, আলতো পায়ে টলতে টলতে এগিয়ে গেছে এক দেওয়াল থেকে অন্য দেওয়ালে। পল, পলি সোনা, দুষ্টু ছেলে কোথাকার! সেসব দিন আজ স্মৃতি। বয়েসের সাথে সাথে শৈশবে খেলার বলটাও কখন যে গড়াতে গড়াতে হারিয়ে গেছে অন্ধকারে, সে নিজেও জানতে পারেনি।

হঠাৎ মনে হলো সে পার্কের মধ্যে দিয়ে দ্রুত হেঁটে চলেছে। শ্লথ হয়ে এলো পায়ের পাতা। বিস্ময়ে অনুভব করলো তার অবচেতন মনের ইচ্ছা, তাই বুঝি তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলো এখানে। আকাশের দিকে ছিটকে উঠছে ফোয়ারার শীর্ণ জলধারা। তারই সূক্ষ্ম জলকণা বৃষ্টির মতো বাতাসে উড়ে এসে পড়ছে তার জ্বলন্ত চিবুকে।

এই তো! কাল এইখানে সে বসেছিলো, আর ও বসেছিলো বেঞ্চের অন্য প্রান্তে! বেঞ্চগুলো খুব সাধারণ, ঠিক অন্যান্য পার্কের মতো। তবু সে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো। দুপুরের একরাশ উত্তপ্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে সে চুপচাপ একা গালে হাত দিয়ে বসে রইলো।

প্রতি মুহূর্তে কে যেন তাকে ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে চলেছে অতীতের কোন সুদূর অতলান্তে, প্রতি মুহূর্তে টুকরো টুকরো হালকা মেঘগুলো ঢেকে দিচ্ছে জ্বলন্ত সূর্যকে। আর শহরের যত বিচিত্র কোলাহল মনে হচ্ছে যেন ভেসে আসছে অনেক অনেক দূর থেকে। তার সাথে তার ভাবনাগুলোও গুঞ্জরিত হয়ে উঠছে অন্তহীন নীলিম আকাশে—

…গুলি করা হবে!

তুমি কি অনুভব করতে পারছো আতঙ্কের সেই স্বাদ? লবণের চেয়েও তিক্ত, তুষারের চেয়েও হিমেল। এ যেন তুষার-পা এক ছোট্ট মাকড়সা, চুপি চুপি তোমার মেরুদণ্ড বেয়ে সোজা উঠে আসছে বুকের কাছে। তারপর কোথায় যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। তুমি তাকে ঝেড়ে ফেলতে চাইলে, মুহূর্তের জন্যে কিছুই ভাবলে না। তবু, পরমুহূর্তেই তোমার হাতে অনুভব করলে সেই হিমেল শীতলতা। মৃদু কাঁপছো, ঘেমে উঠেছে হাতের তালু। প্রাণপণ সে চেষ্টা করলো দৈনন্দিন নানান তুচ্ছতায় নিজের ভাবনাগুলোকে অন্য স্রোতে ঠেলে দিতে। কিন্তু এ যেন জোয়ারের জল, ফল্গুস্রোতের মতো ভাঁটার টানে আবার ফিরে এলো তার কাছে—এইখানে ও বসেছিলো। আচ্ছন্ন চেতনায় সেই একই ভাবনার পুনরাবৃত্তি। জলকণা ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে কয়েকটি মেঘ, কে জানে বৃষ্টি হবে কিনা! সহসা আনন্দের উন্মাদ একটা অনুভূতি, আকণ্ঠ

সংগীতের মতো, নিয়তির মুখমুখি দাঁড়াবার নির্ভীক দুর্জয় আশ্বাসে সে যেন ভরে উঠলো।

কাল, কাল ভোরেই। নিশ্চয়ই, কতক্ষণ আর। ভোরেই নিজের ছোট্ট ঘর-টায় তার ঘুম ভাঙলো। এবং আগের মতো সবকিছুই স্বাভাবিক—তার বই, আন্তঃস্কুল প্রতিযোগিতায় একশো গজ দৌড়ের মানপত্র, সস্তা দামের বেবী-ক্যামেরা। বাইরে সোনাঝরা একমুঠো মিষ্টি রোদ। ছোট্ট খাঁচায় ক্যানারিটা ডাকছে। দু হাতে চোখ রগড়াতে রগড়াতে সে উঠে পড়লো। বাথরুমে গিয়ে পরিষ্কার হয়ে নিলো। পরীক্ষা শেষের সুন্দর একটা ভোর।

প্রাতঃরাশ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই সে ছুটে বেরিয়ে পড়লো সেই পুরনো বাড়িটার দিকে। স্পন্দিত বুক, অশান্ত পায়ে সিঁড়িকটা সে পেরিয়ে এলো। চাবি খোলার আগে বারান্দাটা একবার ভাল করে দেখে নিলো।

দেওয়ালের দিকে মুখ করে সোফায় ও ঘুমচ্ছে। দু হাতের নিবিড়তায় সুসং-লগ্ন হাঁটুদুটো জড়ানো দেহের আরো কাছে। প্রথমেই চোখে পড়লো মৃদু কেঁপে ওঠা ওর কালো চুলের ঘূর্ণি আর অনাবৃত উরুর শুভ চিহ্নটুকু। ও পাশ ফিরলো, কম্বলটা খসে পড়লো নোংরা মেঝেতে।

ঢেকে দেবার জন্যে কম্বলটা তুলে নিয়ে সে অপলক চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। আচ্ছন্ন ঘুমের মধ্যে ওকে কত ক্লান্ত, কত অসহায় মনে হলো। নিশ্বাসের মৃদু ওঠা নামা। স্বপ্নের মাঝে ও দীর্ঘশ্বাস ফেললো। অর্ধো-ন্মীলিত দুটি ঠোঁট, মুখে শিশুর মতো অস্পষ্ট একটা হাসি।

কি নিঃসীম ক্লান্তি ওর সর্বাঙ্গে! সে দেখলো শোবার আগে ডুরেকাটা পায়জামাটা পরে নিয়েছে, সযত্নে স্কার্টটা ভাঁজ করে রেখেছে চেয়ারের ওপর। সোফার কাছে জুতো জোড়া পাশাপাশি রাখা। হলুদ তারাওয়ালা কোটটা ঝুলছে চেয়ারের পেছনে। পায়জামার নিচের অনাবৃত অংশের শুভ্রতাটুকু তার চোখে পড়লো। অপলক রুদ্ধ নিশ্বাসে সে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো, নড়তেও ভয় হয়, পাছে ওর ঘুম ভেঙে যায়।

চোরের মতো নিঃশব্দ পায়ে সে দরজার কাছে ফিরে এলো। ঘুম ভাঙলে আবার আসবে। সন্তর্পনে দরজাটা বন্ধ করে বাড়ির দিকে ফিরে চললো। এখন আরো বেশী আরো স্পষ্ট করে ভাবতে হবে। সবচেয়ে সুবিধে, এখন আর কয়েকদিন তাকে স্কুলে যেতে হবে না। অন্ততঃ ল্যাটিনের ভুল সংশোধন কিংবা হেরম্যান জোরিং'এর আত্মজীবনীর চেয়ে এ অনেক ভালো।

ফিরে এসে দেখলো, মা তখনো রেশন থেকে ফেরেননি। তবু ভালো। মনে হলো ওর জন্যে কিছু খাবার চাই। যদিও বিশ্রী ব্যাপার, তবু জীবন তো তাই। মিডসেফ খুলে এক টুকরো রুটি কেটে নিলো, একটু মাখন আর সোডার বোতলে কিছু কফি। ঠিক যখন সে জামার পকেটে ঢোকাবে, মা ফিরলেন। মার অনুসন্ধিৎসু চোখের সামনে নিজেকে কেমন যেন অপরাধি অপরাধি মনে হলো। তবে কি উনি দেখে ফেলেছেন।

'বেশী নয়, এক টুকরো রুটি নিলাম মা।'

মার হাত থেকে নিস্কৃতি পেয়ে, স্বস্তির গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো পল। প্রথমে ভেবেছিলো—রক্ত হিম করা মার কঠিন চোখ তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠবে। আচ্ছা, ব্যাপারটা ওদের বললে হয় না, উৎগ্রীব হয়ে সে ভাবলো। হয়তো কিছু সাহায্য করতে পারেন। না না, অসম্ভব—কিছুতেই সে তা পারবে না। ওঁরা হয়তো মিছিমিছি আঘাতই পাবেন। এর চেয়ে বরং ভালো নিজের মনে চুপচাপ লুকিয়ে রাখা।

এক ছুটে সে যখন ফিরে এলো, তখনো ও গভীর ঘুমে নিদ্রালস।

নিঃশব্দে ওর পাশে বসে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলো। মন্থর গতিতে এগিয়ে চললো সময়। নিজের অস্তিত্বটুকুও সে যেন ভুলে গেল। দরজার ওপারে দোকান থেকে ভেসে আসছে বাবার কণ্ঠস্বর, খদ্দেরের প্রতি ব্যবসায়ী-সুলভ গোলামির সেই বিব্রত কণ্ঠস্বর, যা হৃদয়ের সবটুকু দিয়ে সে ঘৃণা করে। জীর্ণ কাঠের মেঝের ওপারে সিঁড়ি। উঠানের অন্যদিকে ঘেরা বারান্দায় টাঙানো দড়িতে কাপড় শুকতে দিচ্ছে কোন মহিলা, আর মাঝে মাঝে হাই তুলছে। উনুন তৈরী করার সেই নোংরা কারিগরটা কাঁধে একবোঝা এঁটেল মাটি নিয়ে ভারি পায়ে বাঁধানো চাতালটা পেরিয়ে গেল।

হঠাৎ পদ্মকুঁড়ির মতো ও চোখের পাতা মেললো। বিস্ময়ে প্রথমে দুজনেই অপ্রস্তুত। তরুণী সুলভ অবাক চোখে ও চারিদিকে তাকালো। চকিতে উঠে বসে, পরিণত তন্বীর মতো আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে দু হাতে পায়জামাটা ও কাঁধ পর্যন্ত টেনে তুললো। তারপর চোখ ফেরালো অপরিচিতের দিকে।

'এ আমি কোথায় ?'

'এই, আস্তে !' পেছনের দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে ওকে সাবধান করে দিলো। 'আমরা তো পরস্পরকে চিনি। তোমার মনে পড়ছে না ?'

স্বচ্ছ হয়ে এলো ওর স্মৃতি, গভীর একটা দীর্ঘশ্বাসে ও যেন মুক্তি পেলো।

'এখন মনে পড়ছে। তুমি পল, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আর পেছনে দরজাটা…'

'ওখানে বাবা আছেন। ওটা ওঁর দোকান, উনি তো দর্জি…তোমাকে কাল প্রায় সবই বলেছি।'

ও নিঃশব্দে মাথা নাড়লো। কোন কথা বললো না। এখন সবই ওর স্পষ্ট মনে পড়েছে। হঠাৎ মনে হলো, কম্বলের নীচে ও এমন একটা কিছুই পরেনি। নিঃসীম দ্বিধায় রক্তিম হয়ে উঠলো ওর সারা মুখ, আনত হয়ে এলো চোখের পাতা।

'আমি কিন্তু পোশাক পরবো', মিষ্টি হেসে ও বললো।

'আমি চলে যাবো?'

'না না, যেও না। জানো, কাল ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। রাত্রে কিসের যেন শব্দ, আর পাশের ঘরে কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলেছিলো।

'আমার মনে হয় ইঁদুর।'

'ইঁদুর।' রুদ্ধ ওর নিঃশ্বাস।

পল ওর আতঙ্কিত দু চোখের দিকে তাকালো। 'কেন, ইঁদুর বুঝি হতে পারে না?'

কম্বলের মধ্যেই হাঁটুদুটো চিবুক পর্যন্ত টেনে তুলে দুহাতে জড়িয়ে ধরলো। তারপর আয়ত অপলক চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে গভীর ভাবনার মধ্যে ও ডুবে গেল।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে পল হেসে ফেললো, 'ইঁদুর তোমার খুব ভয় করে, তাই না?'

ও মাথা নাড়লো। মুখের ওপর থেকে সরিয়ে নিলো কালো চুলের ঘূর্ণিটা। 'হ্যাঁ। খুব ছোট বেলা থেকেই…ঠিক ভয় নয়, মানে…ভাবতেই কেমন বিশ্রী লাগে। একবার মারকুইস, আমাদের মেনিটা, একটা ইঁদুর মেরেছিলো। তারপর থেকে আমি ওটাকে আর ছুঁতাম না, এমনকি কাছেও ঘেঁসতে দিতাম না। অবশ্য আমি ঠিক জানি না কেন…'

একমুঠো মিষ্টি হাসিতে সে ওর ভয়টাকে উড়িয়ে দিতে চাইলো।

'না না, তুমি ভয় পেও না। এখানে একটাও নেই, যা আছে ঐ দোকানে।'

'সত্যি বলছো ?'

'সত্যি।'

চোখে মুখে ওর চলকে উঠলো এক ঝলক আনন্দ।

'আঃ বাঁচা গেল! এখন কিন্তু এদিকে একটুও তাকাবে না বলে দিচ্ছি!'

পল জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো। হাতদুটো পকেটের মধ্যে। আশ্চর্য, তাকে তো চলে যেতে বললো না! মেঝেতে শুনলো ওর পায়ের শব্দ, নগ্নদেহ জামা পরার খশখশ শব্দ। রিমঝিম বৃষ্টির মতো সারা দেহে চলকে উঠলো উষ্ণ রক্তস্রোত। শুকনো মুখে সে হাত ঘসলো, সেখানেও আশ্চর্য উত্তাপ।

'হয়ে গেছে…'

স্বাভাবিক ভাবেই পল ঘুরে দাঁড়ালো, যেন এতক্ষণ সে কিছুই ভাবছিলো না। সম্পূর্ণ পোষাকে ও এসে দাঁড়ালো তার সামনে। হলুদ তারাওয়ালা সেই কোট। বিপ্রস্ত একরাশ কোঁকড়ানো কালো চুল। মুক্তোর মতো সাদা দাঁত। যদিও মুখে এখনো ঘুমের মিষ্টি একটা আমেজ, চোখের কোলে শিথিল ক্লান্তি, তবু ভাল লাগলো ওর চোখের স্বাভাবিক দৃষ্টি।

বেড়ালের মতো দেহটাকে টানটান করে বেঁকিয়ে ও হাই তুললো। 'উঃ কাল আমি যা ঘুমিয়েছি না! জানো, বাবা মামনি ফিরে না আসা পর্যন্ত যদি এরকম ঘমুতে পারতাম, কিংবা কোনদিন যদি এ ঘুম আর না ভাঙতো…'

'ও কথা কেন বলছো', পল ওকে দ্রুত বাধা দিলো, 'এভাবে কেউ বলে না।'

'তোমার পক্ষে বলা সহজ, এভাবে কেউ বলে না। কিন্তু তুমি তো জানো না, আমার কাছে পৃথিবীটা কি নির্মম, কি কুৎসিত।'

'তবু তোমার বলা উচিত নয়।'

'হয়তো না, কিন্তু তুমি যদি জানতে…' মুখের ওপর থেকে দুরন্ত চুলগুলো সরাতে সরাতে ও সোফায় বসলো। ক্লান্ত চোখদুটো মেলে দিলো তার দিকে।

হলুদ তারাটার দিকে তাকিয়ে পল বললো, 'ওটা খুলে ফেল না কেন?'

'কেন খারাপ লাগছে ?'

'আমি কি বলেছি খারাপ লাগছে।' কণ্ঠস্বরে তার আহত অভিমান। ভেবেই পেলো না হাত দুটো নিয়ে করবে। 'এমনি খুলে ফেলো না কেন? আমার তো মনে হয় ওটার আর কোন প্রয়োজন নেই, অন্তত এখানে।'

ব্যথিত চোখদুটো ও নামিয়ে নিলো, 'না। এ তারা ছাড়া আমাদের

থাকতে নেই। এ তো আমার দোষ নয়। তাছাড়া এজন্যে আমি একটুও লজ্জিত নই—বাবা, মা, রান্না, সবাই পরে।'

'আমি তোমাকে জোর করছি না। এমনি ভেবেছিলাম···তোমার জন্যে কিছু খাবার এনেছি। খুব সাধারণ। তোমার খিদে পাইনি ?'

'হুঁ। ভীষণ খিদে পেয়েছে। হাসবে না কিন্তু। কাল সকাল থেকে কিচ্ছু খাইনি। ছোট্ট মেয়ের মতো কেঁদে কেঁদে সারাটা শহর কেবল হেঁটেছি। পিসিমা খাবার দিয়েছিলেন, তাও আবার নদীর ধারে কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছিলাম। সত্যি বিশ্বাস করো, সারাটা শহর শুধু পাগলের মতো ঘুরেছি, ঘুরেছি আর ঘুরেছি।'

লোলুপ রাক্ষসের মতো এস্টার রুটিতে কামড় দিলো। ঢেলে নিলো ঠাণ্ডা কফিটুকু। কিছু বুঝে ওঠার আগেই রুটির গুঁড়োগুলো ও মুখ থেকে মুছে ফেললো। উচ্ছল আনন্দে সে ওকে লক্ষ্য করলো, সাথে সাথে যন্ত্রনায় ভিজে উঠলো চোখের পাতা। 'ঈশ! তোমার একটুও পেট ভরলো না।'

'থাক খুব হয়েছে।' চুলগুলো ও মুখের ওপর থেকে সরিয়ে নিলো—'জানো, বাবা বলতেন আমি নাকি একটা পেটুক। তাছাড়া, এমন একটা বিশ্রী সময়ে···বাবা তো আর বড়লোক ছিলেন না। কয়েক মাস আগে তিনি যখন শুধু হসপিটালে কাজ করতেন, তখন আমাদের প্রায়ই না খেয়ে কাটাতে হতো। পেসেন্টরা মাঝে মাঝে রাত্রে লুকিয়ে জানলার সামনে খাবার রেখে যেতো। আমার তো অভ্যেসই হয়ে গিয়েছিলো সকালে উঠে আগে দেখে আসা কিছু আছে কিনা। আমরা যেখানে ছিলাম, বাবাকে ওরা সবাই খুব ভালবাসতো। লোকে বলে শহরের ডাক্তাররা নাকি রাগী। বাবা কিন্তু কাউকে কিচ্ছু বলতেন না···' একের পর এক ছবির মতো ভেসে উঠছে ওর স্মৃতি ওর শৈশব। শাঁখের মতো শুভ্র হাতদুটো ছড়ানো ওর কোলের ওপর। মুখে স্নিগ্ধ প্রশান্তি। 'সত্যি, গ্রীষ্মের আগেও আমাদের এমন দুঃসময় ছিলো না। বাড়ির সামনে ছোট্ট একটা বাগান। মামনি গোলাপ আর ডালিয়া লাগাতেন, আমি লাগাতাম শব্জী, বাঁধাকপি, আলু, গাজর। খরগোশকে কচি ঘাস দিতাম। তুমি কখনো বাচ্চা খরগোশ দেখেছো, একেবারে বাচ্চা? হাতে যখন নাক ঘসে, এত নরম লাগে...আর জানো, বাবামনি মৌমাছি পুষতেন। সে তুমি কল্পনাই করতে পারবে না। প্রাগে জন্মালে দেখতে পেতে কি সুন্দর সব শুয়োরছানা।'

'ধ্যাৎ !'

'আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই !' ঝরনার মতো ঝর ঝর হাসিতে ও লুটিয়ে পড়লো। 'তুমি এমন ছোট্ট না, ঠিক যেন আইভি লতা !'

'মোটেই না,' কণ্ঠস্বরে তার আহত পৌরুষ। 'বেশ, প্রমান চাও', কিছু বুঝে ওঠার আগেই পল দুহাতে ওকে দোলনার মতো তুলে ধরলো। ও বাধা দেবার চেষ্টা করলো, পারলো না। হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠলো। বিবর্ণ হয়ে গেল পলের মুখ, সব শক্তি যেন তার লুষ্ঠিত। চকিতে জীর্ণ সোফায় ওকে নামিয়ে দিয়ে, ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারা করলো, 'ইশ্, চুপ করো লক্ষীটি !'

দোকানের দিকে ওরা ভীরু চোখে তাকালো। থেমে গেল ওর হাসি। নিস্তব্ধ আতঙ্কে দুজনেই অপলক। কয়েকটি মুহূর্ত শুধু নিঃশব্দে ঝরে গেল। তারপর ফিস ফিস করে এস্টার বললো, 'তোমার কিন্তু খুব শক্তি আছে।'

'আছেই তো।'

দরজার ওপার থেকে একটানা ভেসে আসছে মেশিনের গুনগুন শব্দ। উঠোনের ওপর দুপুরের জ্বলন্ত সূর্য। বেড়ালটা বাঁধানো পাথরে টানটান শুয়ে ঘুমচ্ছে, মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধ নিথর। তার সামনে কাদের যেন একটা বাচ্ছা বল নিয়ে খেলছে।

'আমাকে কিন্তু এবার যেতে হবে', নিস্তব্ধতার মাঝে হঠাৎ সে বললো।

'এখুনি যাবে ?'

'হ্যাঁ। খাবার সময় বাড়িতে দেখতে না পেলে ওঁরা খুব ভাববেন।'

'আবার আসবে ?'

'নিশ্চয়ই। খুব শিগ্রি।'

'আজ ?'

ঠোঁটের প্রান্তে ম্লান একটুকরো হাসি। 'হ্যাঁ, আজই আসবো, দেখো।' কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠলো যন্ত্রণার মতো উদাস এক বিষন্নতা। দরজার চাবিটা সে ঘুরিয়ে দিলো।

৪

চুরি করার কথাটাই পলের সবচেয়ে বেশী করে মনে পড়লো। প্রতিবারেই বুক তার কাঁপতো। গলা দিয়ে খাবার নামতে চাইতো না, সব স্বাদই যেন বিস্বাদ। আজকাল প্রতিটা সন্ধ্যা কাটে তার সীমাহীন নিস্তব্ধতার মধ্যে, শুধু বিদ্রোহী কাঁটাচামচের ঠুংঠাং শব্দে। বাবার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি এড়িয়ে পলের বিষন্ন চোখদুটো মেলা থাকে প্লেটের দিকে। এখন কোন কিছু না বলে প্লেটটা তার ঘরে নিয়ে যাওয়া, বা তার থেকে কিছু খাবার ওর জন্যে সরিয়ে রাখা সত্যই কঠিন। অথচ আশ্চর্য, ওঁরা এখনো কিছুই জানতে পারেননি।

'শরীরের দিকে একটু নজর রাখিস পল', মার উদ্বিগ্ন চাপা দীর্ঘশ্বাস। 'আজ কাল বাইরে যা হচ্ছে, একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিস।' যাক, বাঁচা গেল। বাবা এখন জটিল টীকা-সম্বলিত ধর্মগ্রন্থে গভীর মগ্ন হয়ে আছেন।

আজ তিনদিন এস্টার একা ওই ঘরে বন্দী। কালরাত্রে এটা ওকে কিছুতেই বোঝানো যায়নি, যে তাড়াতাড়ি বাড়ি না ফিরলে পথেই গুলি খেয়ে মরতে হবে। তাছাড়া ওকে কিইবা বলার আছে? কিছু না! বরং বাইরে কি ঘটছে এসব ওকে কিছু না বলাই ভালো। অশান্ত ঝড়ের মতো দ্রুত পায়ে সে এগিয়ে চললো। শেষতম বিজয়ের হাসিটুকু তখনো জড়ানো তার দুঠোঁটের প্রান্তে। কত তুচ্ছ, অথচ কি দুর্লভ! বন্ধুর মতো উষ্ণ অন্তরঙ্গতা, চেরিফলের পিঠে, আর সেই মেয়ে!

আসার আগে মনে হয়েছিলো, শুধু রুটিতেই কোন মানুষ বাঁচতে পারে না। পড়ার মতো ওর জন্যে দু একটা বই নিয়ে যেতে হবে। নইলে সীমাহীন নিঃসঙ্গতায় ও যে পাগল হয়ে যাবে। সে যখন থাকবে না, নিঃসীম মুহূর্তগুলো ওর কাটাবে কেমন করে, পাড়ি দেবেই বা কোন সুদূরে? 'জঁা ক্রিস্তভ'টা সে তুলে নিয়েছিলো। তার সাথে 'মজার সৈনিক সুচুয়েক'। বইটা পড়ে নিশ্চয়ই ও খুব হাসবে।

'এই কি ভাবছো'—অস্ফুট এস্টারের কণ্ঠস্বর। কপালের ওপর থেকে চুলের গুচ্ছটা ও সারিয়ে নিলো। দুচোখে আবিল উচ্ছলতা—'ঈশ, তোমাকে আজ যা সুন্দর লাগছে না! জানো, আমার কিন্তু ভীষণ ক্লান্ত লাগছে।'

প্রতিবাদের ভঙ্গিতে সে ওকে বাধা দিলো। যখনি সচেতনভাবে কিছু

ভাবে, নিজেকে সে সরিয়ে রাখে প্রচ্ছন্ন একটা দূরত্বে। সে জানে, সাধ্যাতিরিক্ত কিছু করার ক্ষমতা তার নেই। এমনকি এসব ব্যাপারে কি ভাবে মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় তাও সে জানে না।

'সত্যি পল, কেন বলতো তোমাকে আজ এত সুন্দর লাগছে ?'

সে ওর চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলো। 'জানি না, বিশ্বাস করো, কিছু জানি না। নিতান্তই সাধারণ আমি। জানি না কেমন করে তোমাকে বাইরে নিয়ে যাবো। অন্যকেউ হলে বোধহয় এ কাজ করতোই না।'

'হ্যাঁ পল, তুমি তো জানো না কাকে এখানে লুকিয়ে রেখেছো ? তাছাড়া তুমি আমাকে চেনোই না।'

'চিনি। যখনি কিছু ভাবি, মনেহয় যেন একশো হাজারবছর ধরে তোমাকে চিনি।'

অবাক বিস্ময়ে প্রসারিত এস্টারের নিবিড় কালো চোখ দুটো—'সত্যি ?'

'সত্যি। কিন্তু কেন এসব জিগেস করছো ?'

'কেননা, আমিও ঠিক তাই ভেবেছি পল। হয়তো এ আমার বোকামি, তবু কালরাত্রে তুমি যখন চলে গেলে, আমি তখন ভেবেছি। কেন আমরা দুজন দুজনের সম্পর্কে এমন করে ভাবি ? অথচ গত কাল রাত্রে শুধু আমাদের দেখা, পার্কের সেই ছোট্ট বেঞ্চটায়…তবু মনেহয় যেন পূর্বজন্মেও আমরা পরস্পরের চেনা। হয়তো আমরা ছিলাম ভাই বোন, কিংবা হতভাগ্য কোন প্রেমিক প্রেমিকা। এই, আমি কি সব যাতা বকছি, তাই না ?'

'না না, তাতে কি হয়েছে। তুমি বলো, আমার শুনতে খুব ভালো লাগছে' এলোমেলো স্বরে সে ওকে বাধা দিলো। মেয়েলি কণ্ঠস্বরে মাথা তার ঝিমঝিম করছে, যেন সত্তার গভীর থেকে ঢেউ তুলে দোলা দিয়ে যাচ্ছে হৃদয়ের সবটুকু রক্তস্রোত। আর সে চক্ষু মুদে আসার মতো কোমল ভালবাসার বুকে মাথা রেখে একটু একটু করে ঘুমিয়ে পড়ছে। আবছা আলো ছায়ায় পল দেখলো সোফার একপ্রান্তে ওর অস্পষ্ট দেহরেখা, হাঁটু দুটো পরস্পর সুসংলগ্ন। এক-পাশে ছড়িয়ে পড়েছে কবরীর চূর্ণ কুন্তল। টানটান করে নিজেকে সে সোফায় মেলে দিলো। হাত দুটো ভাঁজ করে রাখলো মাথার পেছনে। হতভাগ্য কোন প্রেমিক প্রেমিকা…পূর্বজন্ম…না না, অসম্ভব। সে অনুভব করলো উর্মিল বিক্ষুব্ধতা, নিঃশব্দ ভৎসনায় কেঁপে উঠলো চোখের পাতা।

'তুমি জানো, ওসব কাল্পনিক পরীদের রূপকথায় আমি বিশ্বাস করি না।

তারারা তো আর আকাশের কোন ছিদ্র কিংবা অন্ধকারের কোন অতল গহ্বর নয়। শুধু একটা অন্ধকারের পেছনে আর একটা অন্ধকার। গাঢ় অন্ধকার। তারারা এক একটা গ্রহ, অসংখ্য গ্রহ, তুষারের মতো হিম চাঁদ। কবিরা তো আর এসব কিছু জানে না, জানে বৈজ্ঞানিকেরা। দূরবীক্ষণ যন্ত্র আর সংখ্যা, আশ্চর্য যত বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন…'

যুক্তিতথ্যের অনেক কিছুই এস্টার বুঝতে পারলো না, তবু উচ্ছল আনন্দে ও ভরে উঠলো, 'সত্যি তুমি এত জানো…'

'আর আমারও ভাবতে ভালো লাগছে যে তুমি…'

'কেন এইসব পাগলামি করছি, তাই না ?

দুষ্টুমির চোখে সে ওর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো, 'পাগলামি। বেশ, তুমি যদি তাই বলতে চাও, বলো। কিন্তু তোমার ব্যাপারটা কি বলতো, এখানে একা একা খুব খারাপ লাগছে, তাই না ?'

'হ্যাঁ। কখনো কখনো মনে হয় পৃথিবীর সব ঘড়িগুলো যেন এক সাথে থেমে গেছে। তাড়াতাড়ি দেওয়ালে কান পেতে শুনি ওপারে ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দ। জানো, ঘণ্টা বাজার শব্দ শুনতে আমার খুব ভালো লাগে—ঢং ঢং ঢং! তুমি না আসা পর্যন্ত আমি উন্মুখ হয়ে থাকি, কখন তুমি আসবে। অনেক দূর সিঁড়ি থেকে আমি তোমার পায়ের শব্দ চিনতে পারি।'

'থাক, খুব হয়েছে।' কপালে চিন্তার রেখা ফুটিয়ে যেন কিছু না বোঝার ভান করলো পল। 'এই দেখ, তোমার জন্যে কি এনেছি, ' ওকে অবাক করে দেবে বলে, আজ সকালে বার্টের কাছ থেকে চেয়ে আনা পুরনো তাসটা টেবিলের ওপর সে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। কিছু না হোক দু এক দান তো খেলা যাবে। 'কি একহাত হবে নাকি ?'

'আমি যে খেলতে জানি না,' কণ্ঠস্বরে ওর প্রচ্ছন্ন অভিমান।

'তাতে কি হয়েছে ? আমি তোমাকে শিখিয়ে দেবো। দেখো, খুব সোজা।'

টেবিলটা সে টেনে নিলো সোফার কাছে। দুজনের জন্যে সবচেয়ে সোজা খেলাটা ওকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলো। আর ও বিপুল উৎসাহে হাঁটু মুড়ে ঝুঁকে পড়লো তার পিঠের ওপর দিয়ে। চিবুকে পল অনুভব করলো ওর নিশ্বাসের মৃদু স্পন্দন। মুহূর্তের জন্যে যেন নিজেকে সে হারিয়ে ফেললো।

'বুঝতে পারলে, খুব সোজা ?'

'কিচ্ছু বুঝতে পারলাম না। তবে শুনতে খুব ভালো লাগছিলো।'

হতাশায় হাতটা সে ফেলে দিলো, 'নাঃ তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না। এখনো গোলামই চিনতে পারলে না?'

'এখন দেখলে তো আমি কি বোকা', আহত অভিমানে এস্টারের ঠোঁট দুটো ফুলে উঠলো। তারপর হেসে সাজানো তাস থেকে ইচ্ছে মতো ছবিওয়ালা একটা তাস তুলে নিলো। 'দেখ...' হরতনের সাহেবটাকে দেখিয়ে ও বললো, 'ঠিক সাবাতার মতো দেখতে। ইয়া বড় বড় গোঁফ...'

'সাবাতাকে আমি চিনি না।'

'নিশ্চয়ই না'—ও হেসে ফেললো। 'আমরা যেখানে থাকতাম ওখানকার কসাইওয়ালা। ঈশ, কি মজাটাই না হতো সে যদি জানতে পারতো তাকে দেখতে ঠিক রাজার মতো। ওমা, এটা আবার কি জন্তু!' চিড়ের টেক্কার দিকে ওর চোখ, 'এটা তো সিংহ নয়, বেড়ালের মতো গোঁফ আর মানুষের মতো চোখ! ম্যাও...'

নিঃসীম হতাশায় পল ক্লান্ত হয়ে উঠলো। 'থাকগে আর খেলে না।' তাস-গুলো গুছিয়ে পকেটে রেখে দিলো। এ রকম বোকা মেয়ের সঙ্গে তাস খেলার কোন মানেই হয় না।

'বারে! তুমি রাগ করেছো?'

'রাগ করবো কেন?'

'আচ্ছা, এখানে একা একা কোন তাস খেলা যায় না?'

সে ওর ভয়টুকু বুঝতে পেরে নিঃশব্দে হাসলো। তারপর চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে মাথা নাড়লো, 'হ্যাঁ, কেন যাবে না।'

বাইরে ছাদের ওপর তখন ঘন হয়ে এসেছে অন্ধকার। গোধূলির তরল অন্ধকারে ভরে উঠেছে ছোট্ট ঘরটা। তবু ওরা আলো জ্বলেনি। উঠোনের ওপারে অন্যকোন ঘর থেকে হলদে আলোর রেখা ঝোলানো পর্দার আড়াল থেকে চুঁইয়ে এসে পড়েছে ভেতরে। কোথায় যেন বেতারের গুঞ্জন। এ বাড়ির দৈনন্দিন প্রতিটা ঘরের শব্দ, প্রতিটা কণ্ঠস্বর পলের আশ্চর্য চেনা। চারতলায় নব বিবাহিতের ঘর থেকে ভেসে আসছে হাতুড়ির শব্দ। ওদের আসবাবগুলো এত জীর্ণ যে স্বামীকে প্রায়ই ঠুকেঠাকে সারিয়ে তুলতে হয়। দোতালায় চিত্র-শিল্পীর সুন্দর সাজানো স্টুডিও থেকে ছড়িয়ে পড়েছে পাঁজর নিঙড়ে নেওয়া করুণ একটা সুরমূর্চ্ছনা, সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলার এক আকুল

বিষণ্ণতা। কয়েকদিন আগে ওর স্ত্রী কার সঙ্গে যেন পালিয়ে গেছে। তারপর থেকে দুপুরে এ বাড়ির বউদের প্রতিদিনের কাজ উঠোনে বসে ওর নামে কুৎসা ছড়ানো—ছিনাল কুত্তি ছাড়া কেউ এমন কাজ করে। অন্য দিক থেকে ভেসে আসছে কার কণ্ঠস্বর, নিশ্চয়ই আমুদে মিশাস্। কিন্তু কেমন করে রিক্ত জীবনের এই প্রদীপগুলো ও জ্বালিয়ে রাখবে, স্টুডিওর প্রতিটা রন্ধ্র থেকে যখন হু হু করে ছুটে আসছে বুকফাটা যন্ত্রণার হাহাকার!

দূরে, বহু দূরে, বিস্তীর্ণ আকাশ, স্ফুলিঙ্গ আর অস্পষ্ট আলোর রেখা। অপলক চোখে সে তাকিয়ে রইলো আকাশের দিকে। অসংখ্য নক্ষত্র আর মানুষ। পৃথিবী থেকে পৃথিবী প্রসারিত সুদূর কোন অসীম থেকে সে যেন শুনতে পেলো অস্ফুট মৃদু গুঞ্জরণ, 'পল...'

ঠিক যখন জানলাটা বন্ধ করে দেওয়ার কথা ভাবছিলো, তখন সে শুনতে পেলো ওর কণ্ঠস্বর। 'তুমি কখনো ভয় পেয়েছো, পল?'

'কিসের?'

'সব কিছুর, এমনকি যে ভাবে আমরা বেঁচে আছি...'

পল স্তম্ভিত। 'হ্যাঁ, মাঝে মাঝে মনে হয়...'

'কিন্তু আমার সব সময় ভয় করে, পল।'

'কিসের ভয়! ইঁদুরের? ঠিক আছে, আমি ওদের জন্যে বিষ মাখানো খাবার রেখে দেবো', বিষণ্ণ হয়ে এলো তার কণ্ঠস্বর।

'তুমি কিন্তু হাসবে না বলে দিচ্ছে, এখানে তো আর কেউ নেই যে কথা বলবো। জানো, মাঝে মাঝে এমন নিঃসঙ্গ, এমন একা লাগে—যখনি কিছু ভাবি কিংবা হাসার চেষ্টা করি, মনে হয় বুকের মধ্যে কি যেন একটা লুকিয়ে রয়েছে...'

সোফা ছেড়ে পল উঠে পড়লো। অন্ধকারে জানলার কালো পর্দাটা টেনে দিয়ে ছোট্ট আলোটা জ্বেলে দিলো। অস্পষ্ট আলোর একটা রেখা এসে পড়লো ওর মুখে। হঠাৎ আলোয় চমক লাগা ওর চোখের দিকে তাকিয়ে ভাবলো ওকে রাগিয়ে দেবে। আসলে ওর ভাবনাকে সে ভয় পায়।

'তারপর, শ্রীমতী ক্যাপুলেট? তোমার মহামান্য পিতার খবর কি? তিনি কি এখনো মন্টাগুয়ের ওপর রাগান্বিত?'

ও লক্ষ্যই করলো না পল কি বলতে চায়। শুধু বাদামের মতো বড় বড় চোখ দুটো ও সামনের দিকে মেলে দিলো। 'না না, তা হতে পারে না! তিনি

এখনো টেরাঝিনে। আমার তো তাই মনে হয়...'

নিজের নির্বুদ্ধিতায় পল লজ্জা পেলো, আরক্ত হয়ে উঠলো তার রুক্ষ চিবুক। অথচ আশ্চর্য সে ওকে এতটুকু আহত করতে পারলো না। ও তো তার মুখের দিকে চেয়ে, একমুঠো যন্ত্রণার স্নিগ্ধ হাসি ভরা খুব সাধারণ কথাই বলতে চেয়ে ছিলো। পল অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো এস্টারের মুখের দিকে।

'এই, আমার দিকে অমন হাঁ করে তাকিয়ে কি দেখছো? ভাবছো আমি একটুও সুন্দর দেখতে নয়, তাই না?'

'মোটেই তা নয়। বরং আমার তো মনে হয় তুমি সত্যিই খুব সুন্দর।'

'তাহলে অমন করে তাকিয়ে কি দেখছিলে বলো?'

মুহূর্তের জন্যে ভাবলো কি বলবে, 'সত্যি, তুমি ঠিক অন্য মেয়েদের মতো...'

'মানে? কেন আমি অন্য মেয়েদের মতো দেখতে হবো না?' চকিতে উন্মত্ত হরিনীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে ও বললো, 'তুমি কি বলতে চাও আমি ইহুদী বলে...'

'না, কক্ষোনো তা নয়।' বিভ্রান্ত স্বরে সে বললো, 'তুমি বিশ্বাস করো, আমি ওসব কিছুই ভাবিনি। অবশ্য লোকে বলে...'

'লোকে কি বলে আমি জানি। অন্যসব মানুষের থেকে আমরা ভিন্ন। আমাদের চোখ মুখ গায়ের রঙ...' বিক্ষুব্ধ ভঙ্গিতে পল ওকে বাধা দেবার চেষ্টা করলো। এস্টার কানই দিলো না। 'জানো, বোকা লোকেরা সবসময়ই এমন সব যাতা ভেবে, দয়া নেই মায়া নেই—যার কোন মানেই হয় না।'

পল উঠে দাঁড়ালো। পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে সারা ঘর অস্থির ভাবে পায়চারি করলো। লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠলো সারা মুখ, দুচোখে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ। চারদিকে তাকিয়ে দেখলো তখনো নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো ও বসে। হাতদুটো কোলের উপর রাখা, মুখে ধূসর একটা ছায়া। বোকা মেয়ে!

এত নিস্তব্ধতার মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলতেও বুঝি তার ভয় হলো।

'না এস্টার। এ আমি বলিনি, বলতে চাইনি...'

ওর ক্লান্ত দুচোখের পাতায় ম্লান একটুকরো হাসি যেন বলতে চায়—আমি জানি। এই মুহূর্তে পলের মনে হলো সে যেন পরিণত রমণীর মুখোমুখি দাঁড়ানো কোন শান্ত বালক। ভালবাসার বাঁধাভাঙা বন্যা বয়ে চলেছে তার শিরা উপশিরায়, যে ভালবাসা—কোমলতা থেকে তিক্ততার দিকে গড়াতে গড়াতে হঠাৎ অরণ্য উল্লাসে ফেটে পড়তে চাইছে তার বুকের সবটুকু রক্ত-

স্রোতে। এস্টার! কেমন করে সে বোঝাবে? কি যে হচ্ছে, আমি নিজেই জানি না। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে চলকে ওঠা কান্নার অবরুদ্ধ আবেগকে সে ধরে রাখতে চাইলো। 'কথা বলছো না কেন? কিছু বলো, এস্টার!'

চকিতে ওর সামনে এসে, পাগলের মতো প্রচণ্ড শক্তিতে পল ওর কাঁধ দুটো ধরে নাড়া দিলো। বুঝতেই পারলো না কেন, নাড়া দিয়ে সে কি ওর নির্ঝরের স্বপ্ন ভাঙাতে চায়! কিন্তু কেমন করে সে ওর অনড় দুঃখকে দুপায়ে অতিক্রম করে যাবে? সমস্ত অবয়ব, সবটুকু শক্তি ও যে নিঃশব্দে ফিরিয়ে রেখেছে তার বিরুদ্ধে। তবু দুহাতের স্তব্ধ করপুটে সে ওর মুখটা তুলে ধরলো। দূরায়ত কোন স্বপ্নের ছায়া ওর সারা মুখে, ঠোঁট দুটো সুসংলগ্ন। নত চোখের পাতায় ওকে এখন মনে হচ্ছে অপরিচিতা, যেন মনটাকে ও ফেলে এসেছে কোন সুদূরে। এই দুঃসহ মুহূর্তে পল ভেবেই পেলো না সে কি বলবে।

'এস্টার! শোন, আমি বলছি, কেঁদো না···লক্ষ্মীটি, শোন···'

সে ওর ঠোঁটে ঠোঁট রাখলো। চকিতে ও মাথাটা সরিয়ে নিলো। তটরেখা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঠোঁট দুটো ওর চিবুকে স্পষ্ট রেখা টেনে দিলো। তবু নিজের ঠোঁট দুটো ওর ঠোঁটের গভীরে হারিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত শান্ত হলো না। আর ও যেন রুদ্ধশ্বাস, মোমের মতো গলে গলে ঝরে পড়লো। দুবাহুর মধ্যে বিবশ হয়ে এলো এস্টারের সারা দেহ! অর্ধনিমীলিত দুটি চোখ, মাথাটা পেছনে হেলানো, ভেঙে পড়া চূর্ণ কুন্তল। রুক্ষ চিবুকে তার নিশ্বাসের উষ্ণ স্পর্শ। দুহাতে নিবিড় করে জড়িয়ে সে ওকে সোফায় শুইয়ে দিয়ে। ঠোঁট দুটো তখনো ওর ঠোঁটের গভীরে।

তারপর হঠাৎই সবকিছু শেষ!

তারপর হঠাৎই আবার সবকিছুর শুরু!

ওরা এখন ভীরু একটা নিস্তব্ধতার মধ্যে, যেখান থেকে শব্দগুলো মনে হয় কোন সুদূর অতীতের। চারদিকে নিঝুম বাড়িগুলো যেন ওদের চুরি করে নিয়ে চলেছে কোন অতল ঘুমের দেশে, অথচ ওরা তখনো জেগে। এই, চেয়ে দেখ, কি নিঃসীম নিস্তব্ধতা!

'কেন এমন করলে?' বাতাসের মতো ফিসফিস করে ও বললো

পল নিঃশব্দে উঠে বসলো। নিস্পলক। বুকের ভেতরটা যেন তার আলোকিত হয়ে গেছে। বালিশে মুখের চারপাশ ঘিরে ছড়ানো ওর একরাশ কালো চুল। দীঘল দু চোখে অস্পষ্ট হাসির রেখা—কেন এমন করলে!

'যেহেতু তোমাকে ভালবাসি! বিশ্বাস করো এস্টার, তোমাকে আমি নিবিড় নিবিড় করে ভালবাসি...'

'কিন্তু কেন এসব বলছো?'

'যেহেতু এ সত্যি। বিশ্বাস করো, এতটুকু মিথ্যে নেই।'

'হয়তো নেই। কিন্তু কেমন করে তুমি জানলে?'

'তুমিই বা কেন এসব জানতে চাইছো?'

'আমার বিস্ময় লাগছে...'

'আমি জানি না। সত্যি তোমাকে আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবো না। হয়তো যখন তোমাকে প্রথম দেখি, কিংবা তোমার যখন খুব খিদে পেয়েছিলো। জানো, কাল সকালে তুমি যখন ঘুমিয়ে ছিলে, আমার ভীষণ ইচ্ছে করছিলো তোমাকে চুমু খেতে। কিন্তু পারিনি, পাছে তুমি জেগে ওঠো। ঠিক জানি না, হয়তো তখনি...' বিব্রতের মতো পল অঙুলে আঙুল জড়ালো, 'এই, তুমি কিছু মনে করেছো? আর সত্যিই যদি মনে করে থাকো...'

এস্টার উঠে বসল। হাঁটু দুটো দুহাতে জড়িয়ে, অবাক চোখে তার দিকে তাকালো, 'সত্যিই যদি কিছু মনে করে থাকি, তাহলে কিছু এসে যায় না, তাই না?'

'মোটেই তা নয়...'

ওর চোখের দিকে তাকাতেই বুঝতে পারলো সে কি বোকা। চোখ দুটো ওর দীপ্ত উজ্জ্বল। মালার মতো দু হাতে ও তার গলাটা জড়িয়ে ধরলো। দু-ঠোঁটের মাঝে এঁকে দিলো বাতাসের মতো স্বচ্ছ চুম্বন। এক ফুঁয়ে কে যেন নিভিয়ে দিলো সমস্ত আলো। আর নিবিড় আলিঙ্গনে ও যেন শিশুর মতো ফুলে উঠলো উচ্ছল হাসির তরঙ্গে, 'আঃ আমিও যে তোমাকে ভালবেসেছি পল! যাই হোক না কেন, আমি তোমায় ভালবাসি...আর কিছু চাই না।'

যত সংক্ষিপ্তই হোক না কেন, প্রতিটা ভালবাসার একটা ইতিহাস থাকে। এ যেন ঝিনুকের দুটি খোলে ছোট্ট একটা ইতিহাস—তার জন্মের তার পরিণতির, তার সূর্যালোক আর অতল জলরাশির, তার বৃষ্টিকণা আর তুষারপাতের!

বাড়ি ফেরার সময় পলের মনে হলো সারা পথ যেন সূর্যালোকিত হয়ে গেছে। যদিও বিভ্রান্তি কোথাও আলো নেই, অন্ধকার। আলো তার বুকের গভীরে। যে আলো তার অমিত শক্তি, তার বিস্ময়, তার ললিত ইচ্ছার আবেগ—যে আবেগ ঝরঝরে সমুদ্র উত্তাল। সে যেন অন্য কোন পলের জন্যে

দুঃখিত, যে পল কোন মেয়েকে চেনে না, প্রতিদিনের নিতান্তই সাধারণ ছিপছিপে কোন তরুণ—সে পল কেমন করে বাঁচবে? সে পল সত্যিই কি বেঁচে ছিলো! আগের চেয়ে সে কি এখন আশ্চর্য বদলে গেছে!

বাড়ি ফিরে পল দেখলো, রান্নাঘরে টেবিলের সামানে বাবা মা দুজনে নিস্তব্ধ মুখোমুখি বসে। কাপবোর্ডের ওপরে রেডিও থেকে ভেসে আসছে সংগীতের মিষ্টি সুর। টিউনিং নবে ঝুলছে ছোট্ট একটা নোটিশ : মনে রাখবেন বিদেশী কোন প্রচার কেন্দ্র শোনার শাস্তি—মৃত্যু! মা পুরনো একটা ব্যাঙের ছাতার ওপর ছেঁড়া মোজা রিপু করছেন। মনে পড়লো ছেলে বেলায় সে ওই ছাতাটা নিয়ে খেলতে কি যে ভালবাসতো। বুঝতে পারলো সেদিনের সেই পুরনো রূপকথা আজ ছলনা। বেশ, সেই খেলাই সে আজ ওঁদের সঙ্গে খেলবে! দেখলো খাবার কিছু আছে কি না। সুগন্ধি কফির সবটুকু শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে বসে রইলো। যেন কফির পেয়ালাটা ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু নেই।

বাবা যে ঐতিহাসিক উপন্যাসখানা পড়েছিলেন, টেবিলের ওপর সেটা মুড়ে রাখলেন, 'তোমার কি কিছুই বলার নেই, পল?'

কফির খালি পেয়ালাটা সে টেবিলে নামিয়ে রাখলো।

'না, তেমন কিছু আছে বলে তো আমার মনে আসছে না।'

'তুমি যেন স্বপ্ন দেখছো পল। এখন তোমার বয়েস আঠেরো, তবু আমার ভয় হচ্ছে সাধারণ জ্ঞানটুকু না আবার হারিয়ে ফেলো। তুমি তো জানো বাইরে এখন কি ভীষণ পরিস্থিতি। এ সময় বাড়িতে থাকাই সবচেয়ে ভালো...'

ছেলের চোখে চোখ পড়তেই তিনি থেমে গেলেন। নির্বাক, নিঃশব্দ প্রতিবাদ ছাড়া তিনি আর কিছুই দেখতে পেলেন না।

'আমি জানি না, কি দোষ করলাম...' চকিতে পল উঠে দাঁড়ালো। তারপর কোন কথা না বলে, নিঃশব্দে রেডিওটা বন্ধ করে দিয়ে নিজের ছোট্ট ঘরে এসে সজোরে দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

একরাশ নিস্তব্ধতার মধ্যে বৃদ্ধ দুজন যখন চুপচাপ, মা তখন কাঠের ছাতাটা রেখে দিয়ে চশমার ফাঁক দিয়ে স্বামীর দিকে তাকালেন। বাবা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন, এবার তিনি শুতে যাবেন। 'না না, মিথ্যে ও বলতে পারে না,' তিনি যেন নিজেই নিজের না পাওয়া প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন, 'কোনদিনও না।'

বই বন্ধ করে, অসহায়ের মতো কাঁধ দুটো তিনি ঝাঁকিয়ে তুললেন।

৫

সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে নিঃসীম একটা ভয়। যে ভয় সারাটা শহরে, সামুদ্রিক আইডারের কোমল ডানার মতো অগণিত মানুষের চোখের পাতায়, যার নিচে কেবল দুঃস্বপ্নই যায় আসে। সারা দেহে, বুকের নিচে হৃদয়ের প্রতিটি রক্তস্রোতে নিঃসীম একটা আতঙ্ক! আতঙ্ক গভীর ঘুমে, নিদ্রালস দায়িতার কোমল বাহুতে, ছোট্ট শিশুর অবাক দুটি চোখে। আতঙ্ক সংবাদ পত্রের প্রতিটা পাতায়, লাউডস্পিকার থেকে ছড়িয়ে পড়া বাতাসের স্তবকে স্তবকে।

'এই কি ভাবছো?' ফিসফিস করে ও বললো, যখন দেখলো সে বিষণ্ণ ম্লান একটা ভাবনার গভীরে ডুবে গেছে, কপালে বিকীর্ণ কয়েকটি রেখা। মাঝে-মাঝে নিজেকে যখনি সে হারিয়ে ফেলে, তখনি তার তন্ময় ভাবনাকে ভেঙে ভেঙে প্রতিধ্বনিত হয় ওর অনন্য কণ্ঠস্বর, যেন কোন সুদূর থেকে ভেসে আসে।

রুক্ষ চিবুকে পল হাত ঘসলো। ঠোঁটে ম্লান একটুকরো হাসি।

'কিছু না। এই, এমনি সব আজেবাজে কথা...'

তবু তার মনে হলো সে ওকে মিথ্যে বোঝাতে পারেনি। তাই নিবিড় করে ওকে বুকের মধ্যে টেনে দু ঠোঁটের কোমলতায় বুজিয়ে দিলো ওর চোখের পাতা। ওর ঘন কালো চুলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে তার নিঃসঙ্গ ভাবনার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সে যেন ছুটে চললো স্নিগ্ধ-গন্ধ অন্ধকারের কোন অতল গহ্বরে।

শুধু তুমি যদি জানতে, মনে মনে সে ভাবলো, অন্তত যদি কল্পনাও করতে পারতে···

গ্রীষ্মের তপ্ত বাতাস উঠে আসছে রাস্তার বুক থেকে। মৌসুমী ফুলের পাপড়িতে পাপড়িতে অজস্র রঙের তোলপাড়। চিরদিনই যা হয়ে থাকে, প্রজাপতিদের রঙিন পাখা নেড়ে ত্রস্ত যাওয়া আসা। তবু সারাটা শহরে, সূর্যস্নাত এই প্রকৃতির অঢেল প্রাচুর্যে কোথায় যেন অশুভ নিষ্ঠুর একটা নগ্ন বর্বরতা ওত্ পেতে রয়েছে। কোবিলিস শহরের সনডারকোমান্দো ফায়ারিং-স্কোয়ার সারাক্ষণই রাইফেলের শব্দে মুখর!

···গুলি করা হবে!

'আমি তোমাকে ভালবাসি পল···' নিবিড় চুম্বনের মাঝে শোনা গেল ওর অস্ফুট স্বর। যদিও অন্তহীন কামনার ঠোঁটদুটি কোমলতায় ভরা, তবু ভাবনা

তাকে মুক্তি দিলো না। তার অবচেতন মনে ভেসে উঠলো কত অসংখ্য নাম। প্রতিনিধি শাসিত সরকার কতৃক প্রচারিত খারকভের প্রতিরোধ সম্পর্কে জার্মান হাইকমাণ্ডের ঘোষিত নির্দেশ—দেওয়ালে দেওয়ালে, পোস্টারে, সংবাদ পত্রের পাতায়, সিনেমার নিউজরিলে, এমনকি টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনেও। শাস্তি বিধা-নের জন্যে এই আইন বলবৎ করা হলো : পুলিশের রেজিসট্রেশন ব্যাতীত কোন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত আশ্রয় দানের শাস্তি—মৃত্যু! আক্রমনকারীদের সমর্থনের শাস্তি—মৃত্যু! আইন বিরুদ্ধ গোপন অস্ত্র রাখার শাস্তি—মৃত্যু। আমি তোমাকে ভালবাসি—আশ্চর্য, এরও শাস্তি কি মৃত্যু? একটু চোখে চোখ রাখার জন্যে, ফিসফিস অস্ফুট গুঞ্জনের জন্যে, কুন্তলের গভীরে মৃদু দীর্ঘশ্বাসের জন্যেও শাস্তি কি মৃত্যু? প্রাগে গেস্টাপোর সদর দপ্তরে টেলিফোনের বুঝি আর অন্ত নেই। সংবাদের পর সংবাদ, এলোমেলো বিশৃঙ্খলা, বিশ্বাসঘাত-কতার চরম শাস্তি, শপথ, অভিশপ্ত জিঘাংসা...অসম্মানজনক অনুসন্ধান চালিয়ে দায়িত্বপূর্ণ লোকদের ধরিয়ে দেবার জন্যে অসংখ্য মুদ্রার প্রতিশ্রুতি। চিরদিনই কি চলবে এই রাইফেলের শব্দ? রক্তের থৈথৈ বন্যায় ভাসবে সমুদ্র!

আমি তোমাকে ভালবাসি...

নাম! অসংখ্য নাম, আর ঠিকানা। তারপর আকাশের বুক কাঁপিয়ে উদ্ধত রাইফেলের শব্দ।

এমনকি ওস্তাগর চিপেকও আজকাল মন্তব্য করা ছেড়ে দিয়েছে। প্রতিদিন সকালে কাগজ পড়া হয়ে গেলে সে এখন নিঃশব্দে টুপিটা খুলে রাখে। সারাটা দোকান জুড়ে নেমে আসে সে এক দুঃসহ নিস্তব্ধতা।

পল নিঃশব্দে তালিকার নামগুলো পড়ে চলেছে। পোস্টারের সামনে সে দাঁড়িয়ে, রুদ্ধশ্বাস, যেন শুধু চোখের দৃষ্টিতেই পড়ে চলেছে নামের পর নাম। পেছনে জ্বলন্ত সূর্য ঢালছে তরল অগ্নিস্রোত ঘামে ভিজে উঠছে সার্ট। পোস্টা-রের সামনে থেকে সে দ্রুত পালিয়ে এলো। পা দুটো তার টলছে। পরের দিনই আবার নতুন পোস্টারে ছেয়ে গেছে, কাগজগুলো তখনো আঠায় ভেজা। তাতেও অজস্র নতুন নাম! নামের মিছিলে স্বচ্ছ যেন কয়েকটি মুখ, হাত, চোখ অগনন চোখ! ওদের মধ্যে নিজের নামটুকু কল্পনা করে নিতে তার এতটুকু কষ্ট হলো না। তার নিচেই বাবা, মা, চিপেক—আগুনি চিপেক···তার নাম, ঠিকানা, ইত্যাদি। তারপর ওর নাম! এস্টার! হয়তো অনুসন্ধিৎসু কোন

চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়বে না সেই নাম, তবু সমস্ত নিস্তব্ধতা কাঁপিয়ে গর্জে উঠবে উদ্ধত রাইফেল···আর্তনাদ। তারপর সব কিছুই নিস্তব্ধ নিথর।

বাড়িতেও সেই একই দুঃসহ যন্ত্রণার নিস্তব্ধতা। অনুচ্চারিত প্রশ্নের মতো অবাক দুচোখের দৃষ্টির মাঝে তাকে বাঁচতে হয়, যাকে সে প্রাণপণ এড়িয়ে চলতে চায়। যাকিছু সে ফেলে এসেছে—উদাস বাউলের ক্লান্ত পায়ের মতো রৌদ্রস্নাত সেই উজ্জ্বল পথটা। চোখ বুজে এখনও সে স্পষ্ট অনুভব করতে পারে রাস্তার দুধারে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, কাদের যেন অপরিচিত কণ্ঠস্বর, ট্রামের ঠুংঠাং, মোটরের হর্ণ। দোকানের সার্সির গায়ে পকেটে হাত ঢুকিয়ে উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ানো একটি বালকের ছায়া। খিলান পেরিয়ে রাস্তা, সেতুর নিচে ক্লান্ত বয়ে চলা নদীর স্বচ্ছ জলধারা। হাতের তালুতে সূর্যকে আড়াল করে মাতাল সৈনিকের ছবি তোলার ব্যস্ততা। ওকে দেখলে মনে হয় যেন কত সুখী। মধুর এই শ্যামলীমা ঠিক যেন ওর দেশেরই কোন দৃশ্যের মতো, আহা, এ যেন গানের সেই কলি—মধুর তোমার শেষ যে না পাই, প্রহর গুনি···

ইস্তেহারে প্রচারিত আদেশ। সংযুক্ত মন্ত্রিসভার হাতে সেই দায়িত্ব পালনের ভার। জীবন যেন এখানে সীমিত একটি ছোট্ট নীড়ে।

সেতুর ছায়ায় হেলানো নৌকার ওপর পল বসে, দুহাতে মাথা রেখে নিস্তব্ধ। ওরা যদি এস্টারকে খুঁজে পায়, তাহলে—তাহলে কি হবে? ছোট্ট একটি প্রশ্ন, আরো সংক্ষিপ্ত তার উত্তর: ছোট্ট পাখির মতো গুলি করে মারা হবে। গোপন গুহা থেকে ওরা ওকে টেনে বার করবে, তারপর গুলি করে মারবে খোলা রাস্তায়। বাবা, মা, বৃদ্ধ চিপেক, শিক্ষনবীশ সেই ছেলেটি, এমন কি ওর সঙ্গে যারা লিপ্ত নয়, অন্তরঙ্গ বন্ধু বার্ট, চার্লস, টিখ থেকে শুরু করে স্কুলের শিক্ষক পর্যন্ত—কোথায় যে এর শেষ কে জানে।

মাঝে মাঝে যখনি এমন একটা দুঃস্বপ্ন তাকে পেয়ে বসে, মনে হয় কি যেন একটা নিঃশব্দে তার শিরার মধ্যে দিয়ে ওপরে উঠে আসছে; অথচ এস্টার এসবের কিছুই জানে না। কাউকে সে জানতেও দেবে না। কাউকে না। কিন্তু কতদিন আর এমন করে গোপন রাখবে! কেমন করে? যখন ও ওর স্মৃতিকে হারিয়ে ফেলবে, যখন ও চিৎকার করে উঠবে? আর যখন চার দেওয়ালের নগ্ন অন্ধকারে পাগল হয়ে যাবে, মুছে ফেলবে চোখের কাজল, এলোমেলো রুক্ষ চুলগুলো উড়বে বাতাসে—তখন? তখন সে কেমন করে ওকে বাঁচাবে? আঃ কবে যে এই রক্তোন্মদনার দিন শেষ হবে? কবে যে শয়তানগুলো ফিরে

যাবে ? হয়তো তখন আবার নতুন করে ভাববে। কিন্তু এখন সে ঘৃণা করে, পাঁজর নিঙড়ে নিঃসীম একটা ঘৃণা। সারা বুক জুড়ে সংগ্রামের প্রচণ্ড একটা উন্মত্ততা। শুধু যদি একটা মেসিনগান থাকতো, উদ্ধত ভঙ্গিতে পিশাচগুলোর বুকের ওপর ট্রিগারটা চেপে ধরতো—খট্ খট্, খট খট্। বিক্ষুব্ধ জনতার ক্রুদ্ধ গর্জন সে অনুভব করলো তার ফেনিল রক্তের সমুদ্রে। আঃ ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ কল্লোলিত ঢেউয়ে সে যদি একবার আছড়ে পড়তে পারতো রাস্তার বুকে, দুটিহাত বাড়িয়ে সেও ছুটে যেতো মিছিলের প্রথম সারিতে। কিন্তু ওরা এত নিশ্চুপ কেন। কেন ওরা শুধু এমন ফিসফিস করে কথা বলে।

'তোমার কি মনে হয়, চিপেক ?' ম্লান অথচ গভীর পলের কণ্ঠস্বর ,'কবে এর শেষ হবে বলতো পারো ?'

'কিসের শেষ ?'

'কিসের আবার, এই যুদ্ধের ?'

'ও। তাই বলো।'

চিপেক চারদিকে তাকিয়ে, কি যেন ভাবতে ভাবতে রুক্ষ চিবুকে হাত ঘসলো। তারপর কাঁচিটা রেখে ষড়যন্ত্রকারীর মতো ফিসফিস করে বললো—'এই শরতেই রাশিয়ার কাছ থেকে চরম আঘাত পাবার জন্যে ওরা এগিয়ে আসছে,পল। একথা তুমি বাজি রেখেও বলতে পারো।'

তাস খেলার সময় ব্যাপারটা বুঝতে কারুরই কোন অসুবিধে হলো না যে রাশিয়ানরা এগিয়ে আসছে। এই বসন্তেই সীমান্ত বিধ্বস্ত হবে, গ্রীষ্মে ওদের ওপর চলবে প্রচণ্ড আক্রমন। আর শীতে, আচ্ছা শীতটা আগে আসতে দাও, তখন বুঝবে। ভুল তাস দেওয়ার জন্যে হাতটা ফেলে দিতে হলো।

তারপর জেনারেল ফ্রন্ট। সাইবেরিয়ান আবহাওয়ায় রাশিয়ানরা অভ্যস্ত। এতো আর মিউনিখের বিয়ার-বিক্রেতার কাজ নয়। তখন হয়তো দর্জির এই ছোট্ট টেবিলটাই যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হবে, আর চিপেক নেমে পড়বে প্রচারের কাজে। দানিপারের এপারে নাৎসীবাহিনী, ওদিকে বজ্রের মতো কঠিন রুশ শক্তি। ঠিক এই খানে—সমস্ত সীমান্ত জুড়ে রাশিয়ানরা শত্রুর অপেক্ষায় ওত্ পেতে আছে, সামান্য সংকেতেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। তারপর পতঙ্গের পাখার মতো টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দেবে দিগন্তে। ক্লান্তিবিহীন চিপেকের ভবিষ্যদ্‌বানী—এই বসন্তেই ইউক্রেনের কি অবস্থায় হয় দেখ না। তারপর গ্রীষ্ম

আর শরত, উঃ সে কল্পনাও করা যায় না।

রোজই চিপেক অধীর আগ্রহে কাগজের দিকে তাকায়, এমন কি জার্মান হাইকম্যাণ্ডের সংক্ষিপ্ত সংবাদেও ওদের কোন দুর্বলতা, কিংবা পূর্ব সীমান্তে যুদ্ধাবনতির কোথাও কোন ইঙ্গিত যদি চোখে পড়ে। না, কোথাও কোন চিহ্ন নেই। অন্তত একটি মনের গোপন ইচ্ছাও যদি বাস্তবে রূপায়িত হতে পারতো, তাহলে চারদিকে থেকে নাৎসীবাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতো। অথচ প্রতিদিনের কাগজ কি প্রচণ্ড উল্লাসে যুদ্ধ জয়ের কাহিনীগুলো বহন করে নিয়ে চলেছে—বলশেভিকদের চরম পরাজয়, যুদ্ধ জাহাজগুলি জলমগ্ন, চুংকিং'এর বিরুদ্ধে জাপানী সৈনিকের অপূর্ব রণকৌশল, উত্তর আফ্রিকায় মার্শাল রোমেলের আশ্চর্য বিজয়, এমনি সব অজস্র কাহিনী।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় পল বার্টে'র বাড়িতে আটকে গেল। ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে ওরা সর্ট'ওয়েভস্‌এ বিদেশী বেতার কেন্দ্র ধরেছিলো। অবশ্য তাতে খুব একটা আশাপ্রদ কিছু না থাকলেও কিছুটা আশাবাদী না হয়ে ওরা পারেনি। অন্তত এখানকার শোনা খবরের সাথে চিপেকের সেই পরীর দেশের রূপকথার খুব একটা অমিল কোথাও নেই।

তাহলে? আরো গভীর ভাবে চিন্তা করতে হবে। তার উচিত এস্টারকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া। কিন্তু কোথায়? কোথায় যাবে ওরা? প্রায়ই দেওয়ালে টাঙানো ইউরোপের মানচিত্রের দিকে সে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে। উন্মাদ, সম্পূর্ণ উন্মাদ ছাড়া কেউ এমন কথা ভাবে। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—চারদিকে, সমস্ত ইউরোপ জুড়ে ওরা পঙ্গপাল অথবা হিংস্র পশুর মতো ওত্‌ পেতে আছে। না, কোন উপায় নেই। বিক্ষত বুকে অতল অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া ছাড়া মুক্তির কোন উপায় নেই। শিরায় শিরায় অনুতে অনুতে সে অনুভব করলো দুঃসহ যন্ত্রণার তিক্ততা। আশ্চর্য, এই কি জীবন।

আমি তোমাকে ভালবাসি।

কিছু একটা করতেই হবে। কিন্তু কি করবে সে? হয়তো ওকে বিয়ে করতে পারে। কিন্তু তাতেই বা কি এসে যাবে? কাল্পনিক সব সম্ভবনার কথাই সে ভাবে। কিন্তু উপায় নেই, কোন উপায় নেই, এস্টার। বাতাসের কানে কানেও গোপন থাকবে না এই সংবাদ। এমন কি অন্য ইহুদী মেয়েদের মতোও বাঁচার অধিকার ওর নেই। সব পথই অবরুদ্ধ। প্র্যাকটিকাল পরীক্ষার দিনগুলো ভীষণ ভাবে এগিয়ে আসছে সামনে, অথচ এতটুকু ভ্রূক্ষেপ নেই তার। বন্ধুদের

সঙ্গে দেখা করা পর্ব একরকম ছেড়েই দিয়েছে। কখনো কখনো কেউ এসে দরজায় কড়া নাড়ে, কিন্তু সে দরজা খোলে না। ভেতরে দুজনে চুপচাপ রুদ্ধ নিশ্বাসে বসে থাকে। ওদের সবাইকে সে এড়িয়ে চলতে চায়। এমন কি আকাশের নক্ষত্রেরাও এখন আর কোন আবেদন পৌঁছে দিতে পারে না তার কাছে। কি প্রয়োজন—জীবনের সব সুর যখন বাউলের ক্লান্ত পায়ের মতো এলোমেলো, তখন কেমন করে সে ওদের কথা ভাববে।

বাতাসে ওড়া ঝরা পাতার মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে তার দিন কাটে। রুক্ষ চুলগুলো উড়ছে হাওয়ায়। ক্লান্তিতে কপালের শিরা উপশিরাগুলো ছিঁড়ে পড়তে চাইছে। তবু, পকেটের মধ্যে হাত ডুবিয়ে সে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কখনো স্বচ্ছ স্রোত শীর্ণ নদীর পাথরগুলোকে ছিটকে ছিটকে জলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যায়। আকাশ ঝামরে শ্রাবণের বৃষ্টি না নামা পর্যন্ত পার্কের বেঞ্চিতে বসে থাকে। অবাক চোখে তাকিয়ে দেখে ছাদের কিনারে মেঘমুক্ত কি নীলিম আকাশ, রাস্তার দুধারে ছুটে চলা ঘোলা জলের বিপুল কল্লোল। আঃ কি অমলিন বিকেলের স্নিগ্ধ বাতাস। বুক ভরে শ্বাস নেয়, অথচ অনুভব করতে পারে না, সে বাতাস অন্যকোন গন্ধ বহন করে নিয়ে চলেছে কি না।

চারপাশের সবকিছুকে সে খুব কমই চোখ মেলে দেখে, যেন একরাশ মগ্ন ক্লান্তির গভীরে ডুবে গেছে। প্রথম প্রথম কি বোকার মতোই না এ সব-কিছুকে সে তুচ্ছ ভাবতো। আমরা দুজনে—আমি আর এস্টার। অথচ এখন ভাবনায় সে নুইয়ে পড়ে, কেমন করে একটি তন্বীর খাবার সংগ্রহ করবে। বাবা মার দৃষ্টি এড়িয়ে, প্রতিদিন নিজের অংশ থেকে লুকিয়ে, কেমন করে ওকে এই নির্লজ্জ ক্ষুধার হাত থেকে বাঁচাবে। ক্ষুধা, কি অপরিসীম ক্ষুধা প্রতি-দিনই দুজনকে সমানে চাবকে চলে। এর আগে জীবনে সে কখনো এমন করে অনুভব করেনি। অথচ এখন একটু পরিশ্রমেই নিজেকে ক্লান্ত মনেহয়। যখনি সে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসে, সারা শরীর ঘামে ভিজে যায়, হাতগুলো কাঁপে, হাঁটুদুটো যেন শ্রান্তিতে ভেঙে পড়তে চায়। এভাবে আর কতদিন চলবে? তবু বাড়ি থেকে সে খাবার চুরি করতে পারবে না। অসম্ভব। তার কাছে মনে হয় এ যেন দুটি বৃদ্ধ মানুষকে কেবল ঠকানো, যাঁরা শুধু তাঁর মুখ চেয়েই বেঁচে আছেন। আজকাল মা প্রায়ই এসব লক্ষ্য করেন, আর একা একা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। রেশনের খাবার এতই অল্প যে কোনরকমে ঐ কটি লোকেরই কুলিয়ে ওঠে না। রুটিগুলোকে সবচেয়ে পাতলা করে কেটেও যখন

ভাগে মেলাতে পারেন না, সে অনুভব করেছে কি নিঃশব্দ যন্ত্রণায় মার চোখ ফেটে জল আসে। না, কিছুতেই সে পারবে না। কিন্তু ওর জন্যে এখন রেশন-কার্ডই বা কোথায় পাবে? কসাই টেরিবার কাছে হয়তো কিছু চাওয়া যায়, একবার সে তাকে সাহায্যও করেছিলো। তারপর আর চাইতে পারেনি। না না, ·নিরীহ সেই বৃদ্ধ মানুষটার কাছে সে কখনো মিথ্যে বলতে পারবে না। কিন্তু এত টাকাই বা সে কোথায় পাবে? সারারাত বিছনায় শুয়ে সে ছটফট করেছে। ভেবেছে প্রথমে কোন পুরনো বইয়ের দোকানে তার বইগুলো সব বিক্রি করে দেবার কথা। এছাড়া আর কোন পথ নেই। দুঃসহ ব্যথা বুকে চেপে একে একে প্রিয় বইগুলো সব বিক্রি করেছে। তারপর কম্পাস, পশমের সোয়েটার, তার সুন্দর জুতো জোড়া সব, ·সবই গেছে। এখন ভাবছে নতুন তাঁবুটার কথা। তারপরেই আসবে সাইকেলটার পালা। ওটা যদি বিক্রিও করে, তবু বাবা মার দৃষ্টি এড়িয়ে এভাবে আর কত দিন চলবে?

কিন্তু, এছাড়া আর কোন উপায় নেই।

বাড়িতে এইটেই সবচেয়ে বিশ্রী: পল, পলিসোনা···মার যত সৃষ্টি ছাড়া উদ্বেগ। আচ্ছা, আমি কি এখনো সেই কচি খোকা! মা কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করবেন না। হাজার চেষ্টা করেও ওঁকে বোঝানো যাবে না। রোজ সন্ধ্যে-বেলায় উনি রান্নাঘরে একা একা বাইবেল খুলে বসবেন। স্তব্ধ করপুট, অর্ধ-নিমীলিত দুচোখে নিঃশব্দ প্রার্থনা। ছোট্ট শিশুর মতো চোখ ফেটে জল আসে পলের। ছোট কাকিমা ওখান থেকে লিখেছেন গ্রীষ্মের ছুটিটা সে ওদের সঙ্গে কাটাবে কি না। গ্রীষ্মের ছুটি! আঃ তিনি যদি জানতেন ছুটির এই দিনকটা তার কি দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যে কাটছে! না না, এখন কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। আমাকে একটু চুপচাপ একা থাকতে দাও! কি হয়েছে পল? পলি, চিরদিন তো আমরা একসঙ্গে একই টেবিলে বসে খেয়েছি। তোমার শরীর কি ভালো নেই? পলিসোনা, এই রাত্তিরে তুমি আবার বাইরে যাচ্ছো? কোথায় যাচ্ছো? মিথ্যে মিথ্যে মিথ্যে!

সেদিন সন্ধ্যার পর সে যখন এস্টারের ওখানে যাচ্ছিলো, হঠাৎ কি মনে করে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো খুব কাছ থেকেই বাবা তাকে অনুসরণ করছেন। ডান পাটা একটু টেনে টেনে খুব দ্রুত তাকে অনুসরণ করছেন। গায়ে সেই লোমের কোট, মাথায় টুপি। কপালের ওপর এলোমেলো ধূসর চুলগুলো বাতাসে উড়ছে। প্রচণ্ড রাগে দ্রুত পল এক পথ থেকে অন্য পথে

এগিয়ে চললো। পেছনে তাকিয়ে দেখলো বাবাও ছুটছেন। কি বিশ্রী! বৃদ্ধ মানুষটা পা টেনে টেনে আপ্রাণ সংগ্রাম করছেন তার সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলার। ধ্যাৎ! চকিতে গলির বাঁক পেরিয়ে একটা দরজার পেছনে লুকলো। প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে বাবাকে সে দেখতে পেলো। রুদ্ধশ্বাস, বুক তার কেঁপে উঠলো। দেখলো গলির অন্ধকারে বৃদ্ধ পিতার চোখ দুটো কি যেন খুঁজছে। বুকের গভীর থেকে উঠে আসা দ্রুত শ্বাসগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে বাতাসে। নদীর স্রোতে ভাসা শুকনো পাতার মতো ক্লান্ত বিষন্ন এক পরাজিত লজ্জায় তিনি যেন আর্তনাদ করে উঠলেন। কপাল থেকে ঘাম-গুলো মুছে নিলেন। এই মুহূর্তে তাঁকে কত বৃদ্ধ কত ক্লান্ত মনে হলো। মনে-হলো ম্লান একরাশ ক্লান্তির অতল গভীরে ডুবে গিয়েও তিনি যেন শেষ মুহূর্তের জন্যে বাঁচতে চাইছেন। জীবন সংগ্রামে বিধ্বস্ত সামান্য দর্জি হয়েও কি আশ্চর্য নেশা তাঁর নিকটতম প্রিয়জনদের সঙ্গে বাস করার। আঃ এখনি যদি সে ছুটে গিয়ে বাবার কাঁধে মাথা রেখে অশ্রুসজল চোখে বলতে পারতো— বাবামনি, তুমি কি চাও আমার কাছে? তুমি তো জানো, তোমার বিষন্ন চোখের দৃষ্টিকে আমি ভয় করি, যে ভয় দিনরাত প্রতিমুহূর্তে আমাকে চাবকে চলেছে। হয়তো তুমি বলবে সাধারণ জ্ঞানের কথা। কিন্তু বাবামনি, আমি জানি না কোথায় তাকে পাওয়া যাবে। জানতে চাইও না। নইলে এই সাধারণ জ্ঞানই হয়তো আমাকে বলবে ওকে ওর অন্ধকার গুহা থেকে রাস্তায় টেনে বার করতে। হয়তো বলবে নিজে হাতে ওকে খুন করতে। আত্মরক্ষা! না, এসব অনেক আগেই তার ভাবা হয়ে গেছে। এখন অন্ধকারে ওকে দুহাতে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। আমি ছাড়া আর কেউ নেই ওকে এই পৃথিবীতে একটু স্থান দেবার।

ও, আর একরাশ অন্ধকার।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় ওরা শুনতে পেলো দরজায় মৃদু কড়া নাড়ার শব্দ। ঠোঁটে আঙুল রেখে পল ইশারা করলো। বুঝতে পারলো দরজার ওপারে বাবার কণ্ঠস্বর। পল! আলোহীন নিরুদ্ধ অন্ধকারের গায়ে গায়ে ওরা মিশে রইলো। কয়েকটি মুহূর্তের নিস্তব্ধতা মনে হলো যেন অন্তহীন। ধমনীর সবটুকু রক্তস্রোতে সে স্পষ্ট অনুভব করলো তার নিজেরই বুকের স্পন্দন।

দরজার ওপারে দাঁড়ানো মানুষটি কিন্তু সহজে ছাড়েন নি। ঝোলানো বারান্দার পাশে অন্য সিঁড়ি দিয়ে দোকানের ভেতরে এসে ছোট দরজাটা

খোলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পারেন নি। তালা লাগানো ছিলো এপার থেকে। হাতলটা শুধু কয়েকবার ওঠা নামা করেছিলো।

তিনি চলে যাবার পরেও, সারাটা সন্ধ্যা কেমন যেন বিষন্ন মনে হলো।

নিচের তলায় কোথায় যেন দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ।

পল যখন চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো, ও তাকে বাধা দিলো না। ও জানতো সে কি ভাবছে। মুখ তার বিবর্ণ পাংশুল। তবু রুক্ষ হাতে সে এলো মেলো করে দিলো ওর চূর্ণ কুন্তল। বিশীর্ণ ঠোঁটের রেখায় ফুটিয়ে তুললো এক টুকরো হাসি। এস্টার যেন অনুভব করতে পারলো ওর আহত যন্ত্রণার নিঃশব্দ আর্তনাদ। প্রতিদানে উপহার দিলো রক্তগোলাপের মতো উষ্ণ একটি চুম্বন।

কিছু না খেয়েই বিছনায় শুয়ে পড়েছিলো পল। সমস্ত চেতনা যেন তার লুণ্ঠিত। ঘুম আসছিলো না। মাথার নিচে হাত রেখে শিথিল ক্লান্তিতে বুজিয়ে-ছিলো চোখের পাতা, আলো নেভাতেও ভুলে গিয়েছিলো। দরজার খোলা শব্দ শুনলো, তবু চোখ বুজিয়ে ঘুমিয়ে থাকার ভান করলো। সে জানতো। বন্ধ চোখের পাতার নিচে দিয়ে দেখতে পেলো তীক্ষ্ণ আলোয় বেঁধা বাবার মুখ। মুখটা নেমে এসেছে তার বুকের অনেক কাছে—ক্লান্ত, ম্লান, অসংখ্য বলীচিহ্ন আঁকা একটি মুখ। স্পষ্ট সে শুনতে পেলো তাঁর রুদ্ধ নিশ্বাস, 'পল…'

শক্ত করে সে বন্ধ করে রইলো চোখের পাতা। প্রতিটা নিশ্বাস প্রশ্বাসে নিদ্রালস মানুষের স্বাভাবিক স্বচ্ছতা। চোখ ফেটে অশ্রুগুলো যেন অবরুদ্ধ ঝরনার মতো বেরিয়ে আসতে চাইছে। মিথ্যে মিথ্যে! কেন উনি আমাকে এমন করে শেখালেন, এখন মিথ্যে বলা ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই

'পল, তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছো? পলি সোনা, তুমি কি শুনতে পাচ্ছো না আমার কথা?'

বৃদ্ধের জীর্ণ হাতটা স্পর্শ করলো তার কপাল। হিমেল একটা স্পর্শ। বাতাসের মতো হালকা। তারপর আলো নিভিয়ে, চোরের পায়ের মতো নিঃশব্দে তিনি বেরিয়ে গেলেন। বিক্ষত বুকে রান্নাঘরে গিয়ে টেবিলের সামনে খবরের কাগজখানা খুলে বসেছিলেন। সামনের পাতাতেই ছাপা হয়েছে একটা ছবি। নিচে লেখা—আততায়ীর হাতে নিহত এস এস ওবারগ্রুপেন-ফুরার রেনহার্ড হেড্রিখ।

এমনি ভাবেই পাগলের মতো টলতে টলতে এগিয়ে চললো দিনগুলি।

৬

বাইরের পৃথিবীর কণ্ঠস্বর ওদের কাছে খুব অস্পষ্টই এসে পৌঁছয়। সারাদিন পল যখন একা থাকে, নিঃসীম একটা ভয় একটা হতাশা তাকে ঘিরে থাকে। তারপর আবার সবকিছুই মুছে যায় ওর চুলের নিবিড় স্পর্শে, চুম্বন আর আনত চোখের পাতার দীপ্ত উচ্ছলতায়। এই অল্প কয়েকটি দিনে জীবন যেন তার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে দুটি পাতায়, মাঝখানে উত্তুঙ্গ প্রাচীর।

গ্রীষ্মের কয়েকটি অনন্ত সন্ধ্যা ওরা একসঙ্গে কাটিয়েছে, নিঃসঙ্গ কয়েকটি তারা আর নিশ্বাসের মৃদু স্পন্দন। নিবিড় স্পর্শ, ফিসফিস কথা, আর নিঃশব্দ চাপা হাসিতে মুখর, কেননা প্রকৃতির নিয়মে যৌবন অন্য অনেক কিছুর চেয়ে আবিল। সেই আবিল উচ্ছলতায় সবকিছুই যেন আশ্চর্য সুন্দর। এই মুহূর্তে মনে হবে দেওয়াল ঘেরা উপকণ্ঠের অতল অন্ধকার ছেড়ে ওরা যেন হারিয়ে গেছে অনেক দূরে, তলিয়ে গেছে আশ্চর্য কোন ঘুমের দেশে।

মুক্তি। হ্যাঁ, কয়েকটা সিঁড়ির ওপারেই মুক্তির স্বপ্নপুরী।

কখনো কখনো ওরা নিশ্চুপ। কথা যখন ফুরিয়ে আসে, ভারি হয়ে আসে তার দুচোখের পাতা: বিশ্বাস করো, তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত এ পৃথিবী সম্পর্কে আমার কোন ধারনাই ছিলো না। সত্যি, দিনের পর দিন শুধু প্রতীক্ষাই করেছি। যখন খুব ছোট ছিলাম, কত কিছুই না কল্পনা করতাম—আমি যেন কোন পাইলট, প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে উদ্ধার করে আনবো কোন সুন্দরী তরুনীকে। তারপর তাকে ভালবাসবো, বিয়ে করবো। জানো, এমন কি নামও কল্পনা করতাম, হয়তো সিনেমায় দেখা কোন নাম। কি বিশ্রী, তাই না? তোমার সঙ্গে ওর কোন মিল নেই। ও শুধু এখন ছায়া, সত্যি ভাবতেও লজ্জা করে। এখন তোমাকে পেয়েছি আমার বুকের সবচেয়ে কাছে, নিবিড় করে। চুলের মিষ্টি গন্ধ। গন্ধটা কিসের বলো তো!

এমনই মুহূর্তে সময়গুলো নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকবে, আর ওরা কথা বলবে ভাষাহীন নিঃশব্দ ভাষায়। কল্পনায় ওদের কোন ভাষা নেই। পাশাপাশি ওরা যেন হেঁটে চলেছে জানলার বাইরে এই সংকীর্ণ গলি ছেড়ে, মুঠো মুঠো রোদ ভরা পৃথিবীর উজ্জ্বল আলোকিত পথে। পায়ে নিচে সবুজ শ্যামলী মাঠ আর রুক্ষ পাহাড়ি হাওয়ায় উড়ছে ওর খোলা চুল। হাতের তালুতে নীলিম আকাশ ঢালছে বাতাসের উচ্ছলতা। দুষ্টু মেয়েটা হাসতে কি যে ভালবাসে।

ঝরনার মতো খল খল হাসি পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে, সে যেন ওকে দুহাতে জড়িয়ে ডুবিয়ে দিয়েছে ঘাসের গভীরে। দেখতে পাচ্ছে ওর মসৃণ ঠোঁটের কোমল দুটি রক্তরেখা, আর আনত চোখের পাতার নিচে ওর নিবিড় কালো দুটি চোখ। সে মুখ রাখলো এস্টারের নগ্ন বুকে। নিটোল দুটি স্তনের ঢালুতে বুজে এলো চোখের পাতা। এখনো কি শোনা যাচ্ছে পৃথিবীর কলগুঞ্জন। পল অনুভব করলো ওর আঙুলের নিষ্পেষণ, যেন তাকে টেনে আনছে ওর বুকের আরো কাছে, আর পৃথিবী ঘুরছে ওদের নিচে। চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। আর ওরা যেন স্বচ্ছ সবুজ জলে সাঁতার কেটে চলেছে। ও ছিলো একটু এগিয়ে, ঢেউ ভেঙে আবার ফিরে আসছে তার কাছে। এ যেন তার কি আশ্চর্য চেনা—নলখাগড়ার বন, শালুক ফোটা সেই পুকুর, মাঠের ওপারে পগলার। কিন্তু বার্চের ছায়া ঘেরা সেই পথটা কোথায়? এই পৃথিবী, এ আমি কোথায়? কেমন করে আমরা ফিরে যাবো? তারপর সব কিছুই আবার ফিরে আসে: ওরা দুজন যেন ট্রেনের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে, নিবিড় করে হাতে হাত রেখে। দৃশ্যাবলীর ছবিগুলো ছুটে চলেছে জানলার পাশ দিয়ে—হলদে, সবুজ, ধূসর…

'পল…'

সে জেগে উঠলো। তার চারপাশে নগ্ন দেওয়াল। 'উঁ!'

শব্দগুলোকে যেন আঁচলে জড়াতে জড়াতে মুহূর্তের জন্যে ও ভাবলো কি বলবে, 'তুমি কখনো কাউকে চিনতে…কোন মেয়েকে?'

অতল বিস্ময় থেকে পল যেন নিজেকে টেনে তুললো, 'কি বলছো তুমি!'

'না, মানে…আগে তুমি যাকে ভালবাসতে। বাসতে না?'

পল নিশ্চুপ। প্রশ্নটা বারবার ফিরে আসছে, যেন তার শিরায় শিরায় ঢেলে দিচ্ছে হিমেল তুষার স্রোত। ছাদের দিকে সে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো। একথা কেন ও জিগেস করলো? যদিও বিব্রত, তবু স্বাভাবিক ভাবেই বললো, 'না। কিন্তু একথা কেন জিগেস করছো?'

'এমনি। আগে কাউকে ভালবাসতে না জেনে খুব খুশী হলাম।'

'কেন?'

'জানি না, যাও!'

এস্টার নিঃশব্দে হাসলো, মাথা তুললো তার কাঁধের ওপর থেকে। অস্পষ্ট

আলোর দুহাতের অঞ্জলিপুটে তুলে ধরলো তার মুখ, আলতো স্পর্শ করলো। তারপর বুকের মধ্যে, নিবিড় উষ্ণতায় ঘুমিয়ে থাকা ছোট্ট পুশির মতো, মুখ গুঁজে নিঃশব্দে পড়ে রইলো। তৃপ্তিতে ঝরে পড়লো গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস।

'এই, তোমার কি হয়েছে বলো তো?'

ও যেন শুনতেই পেলো না। এই উত্তর না পাওয়ার নিস্তব্ধতা তাকে আহত করলো। কি এক অসহ্য যন্ত্রণায় বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠলো। চকিতে পল উঠে বসলো। কিছু না ভেবেই ওকে নাড়িয়ে দিলো। কেঁপে উঠলো গোধূলির অস্পষ্ট আলোক, 'এই, কি হয়েছে তোমার?'

বিস্ময়ভরা সকৌতুক চোখদুটো এস্টার মেলে দিলো, 'আমার? কই, কিচ্ছু না তো! তুমি কি ভেবেছো…'

'কিচ্ছু ভাবিনি আমি।' চকিতে পল ওকে বাধা দিলো, 'বিশ্বাস করো, আমি ভাবছিলাম অন্য কথা...'

'তুমি ভাবছিলে আমার কথা, তাই না?'

রক্তিম ঠোঁটের প্রান্তে ফুটে উঠলো বিষণ্ণ হাসির রেখা। ম্লান দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বললো, 'হ্যাঁ, তোমার কথাই ভাবছিলাম। তুমি কিছু মনে করলে?'

'আহা, মনে করবো কেন? আমিও যে তোমাকে ভালবাসি পল, নিবিড় করে ভালবাসি। বিশ্বাস করো, একটুও মিথ্যে বলছি না।'

'সত্যিই তুমি সুন্দর!'

'মোটেই না। বরং আমার তো ভয় হয়...'

'না, একটুও ভয় করবে না। তাছাড়া আমি কখনো জোর করবো না...'

'আমি জানি, তুমি করবে না। জানো আমি যখন পিসির ওখানে থাকতাম, পিসতুতো ভাই আমাকে ভীষণ বিরক্ত করতো। আমার চেয়ে ও বয়েসে বড়। কিন্তু ও যা চাইতো পেতো না, ওর চেয়ে আমার গায়ের জোর অনেক বেশী। একদিন খুব জোরে ওর হাত কামড়ে দিয়েছিলাম, ও কিন্তু কিছু মনে করেনি...'

প্রচণ্ড রাগে পল যেন ফেটে পড়লো, 'আচ্ছা শয়তান তো!'

'তারপর শোনই না। আমি যখন শহরে থাকতাম, আমাদের স্কুলের হেডমাস্টার, খুব ভাল মানুষ। আমরা সবাই ওঁকে ভালবাসতাম, উনি আবার সবচেয়ে ভালবাসতেন আমাকে। একদিন হঠাৎ পথে দেখা। সামনে পুকুর, বড় বড় নলখাগড়ার ঝোপ। দুপুরের চোখ ধাঁধানো রোদে ঘামছিলাম। কথা

বলার জন্যে উনি দাঁড়ালেন, জিগেস করলেন কেমন আছি, তারপর হাত ধরে আদর করলেন। জানো, তুমি যেমন আমাকে আদর করো, ঠিক ওরকম নয় ··ওঁর হাত কাঁপছিলো, গলার স্বর আসছিলো জড়িয়ে, চোখদুটো চক চক করছিলো। আর কথা বলছিলেন ফিসফিস করে : ছোট্টসোনা, লক্ষীসোনা বলতে বলতে হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে, জানো, এমন জঘন্য আর বিশ্রী··· আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। উনি এমন আমি কল্পনাই করতে পারিনি...'

'দোহাই তোমার, চুপ করো।' অস্থির ভাবে সে ওকে বাধা দিলো, তারপর সারা ঘর পায়চারি করলো।

'বেশ, আর কক্ষনো বলবো না। জানো, আমি খুব সাধারণ, একেবারে গেছো। মেয়েরা আমাকে ডাকতো স্টেলা বলে। এই স্টেলা শোন, এই স্টেলা দেখ। তারপর যখন বড় হলাম, হঠাৎ দেখলাম আমি এস্টার, ইহুদী মেয়ে। যেন আমি অন্য কেউ। একেবারে হঠাৎ···জানো, বাবা আমাকে আদর করে বলতেন ঐ রকম হয়। আমার কিন্তু মনে হতো এ অন্যায়। কারুর সাথে বন্ধুত্ব করতাম না, এমন কি কথাও বলতাম না—ওরা যে আর্য। তোমার কি মনে হয় পল, সত্যি তুমি আর্য? আর তোমার সোনালী গায়ে রঙ। ওরা তো বিশেষ করে বর্ণের কথাই বলে...' ঠোঁটের কোনে মৃদু হাসি। আঙুলগুলো ওর তখনো খেলা করছে তার চুলের গভীরে।

'এ তুমি কিসব যাতা বলছো!' ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো পলের কণ্ঠস্বর। যদিও ভাল লাগছিলো, তবু ওর দুবাহুর নিবিড়তা থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করলো।

'আচ্ছা, আর বলবো না। তোমার চুলগুলো সত্যিই সুন্দর। জানো, আজকে এমন মজা লাগছে না, ইচ্ছে করছে ভীষণ হাসতে। তাছাড়া আমি তোমাকে ভালবাসি। এখন কিছুই এসে যায় না, এমন কি তুমি আর্য হলেও না...'

'আবার? এসব তুমি ইচ্ছে করেই বলতে চাও।'

হঠাৎ একটা দুষ্টুমি বুদ্ধি খেলে গেল ওর মাথায়, 'আচ্ছা পল, তুমি নাচতে পারো?'

'একটু একটু পারি। কয়েক দিন শিখেছিলাম।'

'আমাকে যেতে দিতো না। আমার খুব সুন্দর একটা ফ্রক ছিলো। মা বলার পর আমি ওটা রোজ ঘরে পারতাম। বাবা আমাকে নাচ শেখাতেন।'

'আমার কিন্তু নাচতে একটুও ভালো লাগতো না, কেমন যেন মেয়েলি মনে হতো। অবশ্য আমরা প্রায়ই ভিড় করে পল জোনের নাচ দেখতাম।'

'আমার কিন্তু নাচতে খুব ভালো লাগতো।'

'কোথায় তুমি নাচ শিখতে?' কণ্ঠস্বরে তার অবাক বিস্ময়।

'এমনি, বাড়িতে। শোবার ঘরে সব আলোকটা নিভিয়ে দিতাম, যাতে কেউ দেখতে না পায়। পিয়ানোর সামনে বসে মা ওয়াল্টজ্ বাজাতেন আর বাবামনি তাল শেখাতেন। এক দুই তিন—টারাটাটুটা, টারাটাটুটা। সত্যিই উনি এত ভালো শেখাতেন, আমি খুব তাড়াতাড়ি শিখেছিলাম। তাছাড়া ওরা সবসময়ই চাইতেন আমাকে সুখী করতে। এসো না একটু নাচি...'

'পাগল হয়েছে...' আয়ত দুটি চোখের পাতায় তার স্তব্ধ বিস্ময়। ও কিন্তু লাফিয়ে উঠলো। হাত ধরে তাকে টানতে টানতে নিয়ে এলো, পা থেকে খুলে গেল ওর স্যাণ্ডেল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে উঠে দাঁড়ালো। কোঁকড়ানো রুক্ষ চুলগুলো দুহাতে ঠিক করে প্রত্যাখানের ভঙ্গিতে সে মাথা নাড়লো।

'না পল, না। আমার এত ভালো লাগছে...' মিনতির মতো করুণ ওর কণ্ঠস্বর। অজানা উত্তেজনায় আরক্ত চিবুক। 'কেউ দেখতে পাবে না। জানো, তোমার সঙ্গে এখানে আমার এত ভালো লাগছে না! দাঁড়াও এক মিনিট, আমি এখুনি আসছি, তুমি ততক্ষণ দেখ, রেডিওতে কোন বাজনা পাও কিনা।'

কিছু বুঝে ওঠার আগেই দরজার চাবিটা ও ঘুরিয়ে দিলো। দোকানের দিকের দরজা দিয়ে ভেতর গিয়ে আলোটা জ্বেলে দিলো। স্তব্ধ বিস্ময়ে ওর দিকে তাকাতেই কেঁপে উঠলো পলের কণ্ঠস্বর, 'এই, কি হচ্ছে কি! আলোটা নিভিয়ে দাও, ব্ল্যাক আউটের রাত, এটা বুঝতে পারছো না কেন? দোহাই তোমার, আলোটা নিভিয়ে দাও!'

তারপর জানলার সামনে এসে ছোট্ট রেডিওটা পল চালিয়ে দিলো। বৃথাই চেষ্টা করলো নাচের কোন বাজনা পেতে। প্রাগের কোন স্টেশনের বদলে যা পাওয়া গেল—শবযাত্রার বিশ্রী একটা ঘড়ঘড় শব্দ, ড্রামের আওয়াজ, আর হাসপাতাল থেকে গীর্জা পর্যন্ত রাজপ্রতিনিধিদের শেষ মৃত্যু তালিকা। তাড়াতাড়ি রেডিওটা সে বন্ধ করে দিলো। যখন ঘুরে দাঁড়ালো, প্রচণ্ড হাসিতে পল ফেটে না পড়ে পারলো না। দরজার সামনে অদ্ভুত পোষাকে এস্টার দাঁড়িয়ে। অর্ধেক তৈরী ছেলেদের একটা জ্যাকেট পরেছে, হাতাগুলো শুধু বড় বড়

সেলাইয়ে টেঁকা বিশাল আস্তিনের মধ্যে হাতদুটো ওর হারিয়ে গেছে, প্যাড দেওয়া ভারি কাঁধদুটো নেমে এসেছে অনেক নিচে। জ্যাকেটের শেষ প্রান্তটা এসে পৌঁছেচে ওর হাঁটুর কাছে।

স্তব্ধ হতাশায় পল হাত ছুঁড়লো, 'আমি কি কাঁদবো। এটা কি হয়েছে শুনি ?'

'কেন, ভাল দেখাচ্ছে না বুঝি ?' এস্টার মুখ টিপে হাসলো, তারপর নাচের ভঙ্গিতে হালকা অথচ দ্রুত পায়ে তার কাছে এসে আনত হয়ে অভিবাদন জানালো, 'মহামান্য অতিথি, আমি কি এবার পরবর্তী নৃত্য শুরু করতে পারি ?'

'অপূর্ব।' একই ভঙ্গিতে পলও ওর সঙ্গে যোগ দিলো। টানা টানা দীর্ঘ উচ্চারণে বললো, 'কিন্তু মহামান্যা, আমার প্রোগামটা যে ও ঘরে পিয়ানোর ওপর ফেলে এসেছি। সুতরাং বাজনার আর কোন সম্ভবনা নেই।'

সে ওর জ্যাকেটটা খুলে নিলো, সেলাইগুলো সরে গেছে। তারপর দুবাহুর নিবিড়তায় ওকে জড়িয়ে ওয়াল্টজে্র মিষ্টি শিস দিলো—টারাটাটটা, টারা-টাটটা। টেবিল, চেয়ার আর সোফার সংকীর্ণ পথটুকুর মধ্যে দিয়ে ওরা ঘুরে চললো। স্পন্দহীন, যেন জীবনের কত উচ্ছল আনন্দেই না ওরা মগ্ন! নাচের তালে তালে দেওয়াল থেকে দেওয়ালে, টেবিলে সোফায় ছাদের শিলিংএ কেঁপে কেঁপে দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে সুসংলগ্ন দেহের দীর্ঘ প্রবাহিত দুটি ছায়া। অস্পষ্ট আলোছায়া এসে পড়েছে ওদের মুখে। সহসা পলের মনে হলো এস্টার ওর দেহটা আরো নিবিড় করে মিশিয়ে দিয়েছে তার দেহে। মাথাটা হেলে পড়েছে পেছনে। আয়ত চোখের পাতা, ঠোঁটদুটো বিচ্ছিন্ন। নাচের নানান ছন্দে ওকে মনে হচ্ছে কি আশ্চর্য কোমল আর হালকা—যেন রহস্যময় কোন গঙ্গাফড়িং, তুষারকণা কিংবা মানবীর কোন স্পন্দিত নিঃশ্বাস!

হঠাৎ ছোট্ট সুটকেসে হোঁচট খেয়ে ওরা হারিয়ে ফেললো ভারসাম্যতা। দুজনেই স্খলিত বৃক্ষের মতো এসে আছড়ে পড়লো সোফার ওপরে। তখনো এস্টারের দুবাহুর নিবিড়তায় জড়ানো তার গলা। দুজনেই প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়লো। ওর অজস্র চুলের গভীরে পলের আঙুল এখন নিঃশব্দে খেলা করছে।

'আমরা দুজনেই পাগল।'

'আঃ চিরদিন যদি এমন পাগল হতে পারতাম।'

'এস্টার ?'

'উঁ...'

ঠিক এই মুহূর্তে সে চিনতে পারলো না ওর চোখদুটো, কি আশ্চর্য উজ্জ্বল!

বন্দী পাখির মতো নির্নিমেষ চোখে পল তাকিয়ে রইলো ওর দিকে, শিরায় শিরায় রক্তের উষ্ণ স্পন্দন। তার বুকের ঠিক নিচে ওর কোমল স্তনদুটো কেঁপে কেঁপে উঠছে। কল্পনাতীত এক আশ্চর্য আবেগে এস্টার তাকে দুহাতে জড়িয়ে পাগলের মতো ওর দুঠোঁটের মাঝে নিজের ঠোঁট দুটো চেপে ধরলো। পল চোখ বন্ধ না করে পারলো না, যেন সব শক্তি তার লুণ্ঠিত।

যেন স্বপ্নের মধ্যে অবিলোপী সংগীতের মতো সে শুনতে পেলো এস্টারে কোমল কণ্ঠস্বর, 'আমাকে তুমি কোনদিন ছেড়ে যেও না পল, প্রিয়তম আমার। আঃ আমি আর কিছু চাই না, শুধু যদি তোমার মধ্যে নিজেকে লুকতো পারতাম...'

আরো নিবিড় নিবিড় করে পল ওকে টেনে নিলো বুকের কাছে। আগুনের উত্তপ্ততা ছড়িয়ে পড়লো সারা দেহে। এখন সব কিছুই বিবর্ণ, শুধু ও আর ওর কোমল স্পন্দন। এ যেন কোন সুদূর দিগন্তে ডানা মেলে উড়ে চলা। নিবিড় ভালবাসায় সে চুমু দিলো ওর সারা মুখে। আঃ হৃদয় এখন তার বেজে চলেছে উদাত্ত ঘণ্টাধ্বনির মতো। আর ওর নিশ্বাস, স্পন্দিত পাখার মতো দ্রুত কেঁপে যাচ্ছে তার কপালে, চুলে, আরক্ত চিবুকে। সে যখন তার ঠোঁটদুটো নামিয়ে আনলো ওর পীনোন্নত বুকের নগ্ন স্তনে, দুর্মর প্রত্যাখানের ভঙ্গিতে সারা দেহ ওর টান টান কঠিন হয়ে উঠলো, 'না, পল না। এখন নয়, আজকে নয়... শোন, শুনছো ? লক্ষীটি, অমন করে তাকিও না...'

তবু ওর চোখ ফেটে জল না আসা পর্যন্ত একটুকু শিথিল হলো না তার বাহু-বন্ধন।

আবার সে ফিরে এলো তার বাস্তব পৃথিবীতে। এ যেন ভরা জোয়ার থেকে আবার ভাঁটায় ফিরে আসা। আনত চোখের পাতায় লজ্জার রেখাটুকু ছাড়া এখন আর কিছু নেই, শুধু বিস্তীর্ণ কামনার তিক্ত অনুভূতি। সহসা নিজেকে তার মনে হলো মরুভূমির মতো রিক্ত। দুজনের মধ্যে আবার গড়ে উঠলো সেই দূরত্বের প্রাচীর। নিজেকে কেমন যেন কান্নার মতো মনে হলো।

সোফায় উঠে বসে রুক্ষ চিবুকে পল হাত ঘসলো। নগ্ন অভিজ্ঞতার ভারে আনত হয়ে এলো তার চোখের পাতা, আপ্রাণ চেষ্টা করলো মৃত্যুর মতো এই হিমেল বিষণ্ণতাকে দুহাতে ভেঙে দিতে।

'জানলাটা কি খুলে দেবো, একটু হাওয়া আসবে ?'

৭

অন্ধকারে ওরা দুজন চুপচাপ বসে। আকাশের বৃত্তে ফুটে উঠেছে প্রথম কয়েকটি তারা। ম্লান চোখে সে তাকিয়ে দেখলো। এলোমেলো ভাবনার যন্ত্রণা তখনো তার বুকে—ভাষাহীন, আনত লজ্জার তীক্ষ্ণ একটা অনুভূতি। অভিমান আহত মনে শুধু টেনে চলা এই নিঃশব্দ ক্লান্তি। সারা দেহ তার টান টান, নড়তেও ভয় হয়, পাছে ও কিছু মনে করে। কিন্তু কেন? কেন ও তাকে এমন করে দূরে ঠেলে দিলো? ও কি অপমান করতে চেয়েছিলো? কিছু বুঝে উঠতে পারলো না পল, শুধু বাহুসন্ধিতে অনুভব করলো ওর নিশ্বাসের মৃদু স্পন্দন, দেহের কোমল উষ্ণতা। ও কি ঘুমিয়ে পড়েছে?

অন্ধকারের অতল থেকে সে শুনতে পেলো ওর কণ্ঠস্বর।

'এই, তুমি রাগ করেছো?'

'না।'

'সত্যি?'

সে কিছু বললো না। সে চায়নি ওকে এভাবে মিথ্যে বলতে।

'পল, তুমি কথা বলছো না কেন?'

'ভাবছি।'

'কি ভাবছো? বলো না, লক্ষ্মীটি, এমন চুপ করে থেকো না।'

'বিশেষ কিছু না, এমনি ভাবছি।'

পল দেখলো, আহত অভিমানে ও একটু দূরে সরে গেল। 'তুমি ভীষণ নিষ্ঠুর। কি করেছি আমি? তুমি কি ভাবছো আমি…'

'না না, ও কথা এখন থাক'…চকিতে সে ওকে বাধা দিলো। 'বললাম তো কিছু হয়নি।'

'মোটেই না, নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। আমার ভয় হচ্ছে, পাছে তুমি যদি… বিশ্বাস কর পল, আমার মতো তোমারও কি কষ্ট হচ্ছে?' পল নিশ্চুপ। 'আমি চাই না তোমার এমন কষ্ট হোক। সত্যি বিশ্বাস করো, আমি একটা ভীষণ বোকা…'

বুকের গভীর থেকে উঠে এলো একটা দীর্ঘশ্বাস। কল্পনায় সে অনুভব করলো ওর চুলের মিষ্টি গন্ধ। কিন্তু সব সৌরভই যে নিশ্চিহ্ন! এখন আর ছলনা করা যায় না। ছলনা করতে সে চায়ও না।

এস্টার নিঃশব্দে তার বুকে মাথা রাখলো, কানটা চেপে রাখলো তার বুকে।

'এই, কি করছো?'

'শুনছি। জীবন্ত একটা হৃদয়ের স্পন্দন। নড়ো না, ঐতো শোনা যাচ্ছে... ধুকধুক, যেন ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে। আঃ ওখানে যদি একটা ছোট্ট চুমু দিতে পারতাম...'

'তুমি একটা দুষ্টু! কেন শব্দ হবে না?'

'কিন্তু মৃত্যু হলে আর কোন্ স্পন্দনই থাকবে না।'

'সেটা কি এমন আশ্চর্যের কিছু?'

'হয়তো না। তবু তো স্পন্দন থেমে যাবে। নিশ্বাস নিতে পারবো না এ কথা ভাবতে আমার বিশ্রী লাগে। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি কি বোকা। এই তো নিশ্বাস নিচ্ছি—গভীর গভীর আরো গভীর, এ পৃথিবীতে যা আমার সবচেয়ে দুর্লভ!'

ওর পাগলামীকে সে বাধা দিতে পারলো না, রাত্রির তপ্ত বাতাসে দুজনে বুক ভরে নিশ্বাস নিলো। অন্ধকারে মনে হলো কি সুন্দর, কত সহজ, সবাই পারে। তবে কি আমরা দুজনেই পাগল—মনে মনে সে ভাবলো, তবু নিশ্বাস নিলো। তুমিও বুক ভরে নিশ্বাস নাও এস্টার, থেমো না, কোনদিন থেমো না।

জানলাটা বন্ধ করার জন্যে সে উঠে দাঁড়ালো।

'না না, বন্ধ করো না, পল। আমি আকাশ দেখবো। রাত্রে যখনি নিঃসঙ্গ লাগে, আমি আকাশ দেখি। অন্ধকার আমার একটুও ভালো লাগে না।'

'আমারও না।'

জানলাটা ভালো করে খুলে দিয়ে সে আবার ফিরে এলো সোফার কাছে। সিগারেট ধরালো। আলোর রক্তিম আভাটুকু মনে হলো উত্তাল সমুদ্রে ভাসমান কোন বয়া। দুহাতে সে ওর গলা জড়িয়ে ধরলো, চেষ্টা করলো অন্য কিছু ভাবতে। হৃদয়ের সবটুকু দিয়ে সে মৃত্যুকে ঘৃণা করে, যে মৃত্যু নিঃসঙ্গ, যে মৃত্যু নত করে দেয় মানুষের মাথা। ও কেন মৃত্যুর কথা বললো? মৃত্যু তো সারা শহর, সারাটা দেশ জুড়ে। অথচ এস্টার এসবের কিছুই জানে না।

'আচ্ছা, যুদ্ধ শেষ হলে তুমি কি করবে? অন্তত আমার বউ হওয়া ছাড়া?'

'তোমার বউ!'

সে অনুভব করলো ওর স্তনের কোমল স্নিগ্ধতা।

'নিশ্চয়ই। কেন এস্টার, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না?'

'করি পল। তুমি ছাড়া আমি আর কাউকে বিশ্বাস করি না। তাছাড়া এখন আমার আর কেউ নেই। তবু কি আশ্চর্য ভালো লাগছে। আচ্ছা, কবে আমাদের বিয়ে হবে বলো তো? আর যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি আমাকে ভালবাসবে? তার আগে যদি আমাদের দেখা না হয়, কিংবা কোন সম্পর্ক না থাকে, তাহলে কি হবে? যদি এমন হয়, রাস্তা দিয়ে আমরা দুজনে হেঁটে যাচ্ছি, তোমরা সঙ্গে হয়তো অন্য কোন মেয়ে, তুমি আমার দিকে ফিরেও তাকালে না...'

'কক্ষনো না'—প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে উঠলো পলের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর।

'হয়তো না। কিন্তু সবকিছুই এমন আশ্চর্য মনে হয়, তাছাড়া তখন হয়তো আমরা অনেক বদলে যাবো। আর তুমিও এমন গম্ভীর...'

'হতেই পারে না।'

'তবু তুমি একটু গম্ভীর, একটু রুক্ষ মেজাজী। আর আমি...'

'আর তুমি একটা দুষ্টু, ভীষণ দুষ্টু।'

'বাবামণি বলতেন আমি নাকি একটা খরগোশ।'

'ঠিকই বলতেন। কিন্তু বিশ্বাস করো, তোমাকে আমি সত্যিই ভালবাসি। এ পৃথিবীতে কাউকে আর এমন করে কখনো ভালবাসিনি।'

'আগে বলো, আমাকে পেয়ে তুমি খুশী হয়েছো?'

কক্ষচ্যুত স্খলিত শব্দগুলো যেন কোন সুদূর থেকে আসা প্রগলভ কোনো মেয়ের বানানো রূপকথার মতো মনে হলো। পল অনুভব করলো গলায় মালার মতো জড়ানো এস্টারের হাতদুটো শিথিল হয়ে নেমে এসেছে কাঁধের ওপর। মুখ ফিরিয়ে দেখলো—সমুদ্র ঝিনুকের মতো ওর অবাক চোখদুটো তখনো তার দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে।

'তোমাকে পেয়ে আমি পাগলের মতো খুশী হয়েছি, এস্টার।'

দুহাতের করপুটে সে ওর মুখটা তুলে ধরে আলতো করে চুমু দিলো।

'কিন্তু আমার কথার উত্তর দিলে না তো, যুদ্ধ শেষ হলে কি করবে?'

'আমি? নাচ শিখবো।'

'সালোমির মতো?'

'না, নাম কিনতে আমি চাই না। তার জন্যে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়। আমি শুধু শিখতে চাই। ঘরের মধ্যে, যাতে কেউ দেখতে না পায়। হয়তো

টেবিলের রঙিন ঢাকাটা তুলে নিয়ে বাগানময় ছুটে বেড়াবো, বাবামনি দেখে হাসবেন : এই এস্টার—দেখ দেখ মেয়ের কাণ্ড, আচ্ছা পাগল তো! আমার যখন যা মনে আসবে তাই নাচবো। যখন খুব খারাপ লাগবে, করুণ নাচ নাচবো। জানো, মামনির সঙ্গে একবার ব্যালেতে জলপরীর নাচ দেখতে গিয়ে-ছিলাম। ঈশ, এমন সুন্দর না! হয়তো আমিও একদিন থিয়েটারে নাচবো। বিশাল মঞ্চ, চারদিকে অসংখ্য আলো—নাচের তালে তালে ঘুরে চলেছে। তারপর আলো নিভে যাবে, করতালিতে মুখর হয়ে উঠবে সারা ঘর। আর আমি—আনত হয়ে অভিবাদন জানাবো। তারপর বেরিয়ে আসবো বাইরের খোলা হাওয়ায়…'

'আর আমি হয়তো তখন বাইরে তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো। বলবো, বাঃ আজ তুমি খুব সুন্দর নেচেছো।'

'তারপর আমরা দুজনে হয়তো অন্য কোথাও যাবো, খুব নির্জন এমন কোথাও। যেখানে শুধু তুমি, আমি আর পাইনের পাতার মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝিরঝিরে মিষ্টি বাতাস। বাতাস তোমার ভালো লাগে?'

'হ্যাঁ। শরৎ আমার খুব ভালো লাগে। পাতাগুলো যখন একে একে ঝরে যায়, এমন শান্ত আর সুন্দর লাগে।'

'আর তুমি কি করবে?'

'আমি? পড়বো। অনেক অনেক পড়বো।'

'তারাদের সম্পর্কে?'

অবাক বিস্ময়ে পল মুখ তুলে তাকালো, 'তুমি কেমন করে জানলে?'

'এমনি ভাবলাম।'

'সত্যি জানো, কতদিন ভেবেছি প্রতিদিন সন্ধ্যে বেলায় আমি বেশ মান-মন্দিরে যাবো। অনেক উঁচু মিনারের চূড়ায় উঠে আকাশ দেখবো। সত্যি এ এক বিস্ময়! যখন খুব ছোট ছিলাম, রাত্রে ঘাসের ওপর শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা দেখতে দেখতে মনেই হতো না আমি ঘাসের ওপর শুয়ে আছি। তারপর উড়তে উড়তে পৌঁছে যেতাম তারাদের কাছে। বশিষ্ঠ অরুন্ধতী অত্রি, আকাশের যত প্রাচীন মুনি ঋষি! আর একটা বিস্ময় এই শুকতারা। জানো, চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হবে ওটা বুঝি গোল নয়, সাধারণত লোকে যা কল্পনা করে…মনে হবে যেন বন্ধনহীন কোন জ্যোতিষ্ক শূন্যে ঝুলছে। ভাবতেই তোমার মাথা ঝিমঝিম করবে। কিন্তু সত্যিই যদি

জানতে হয়, যেতে হবে গণিতিক প্রশ্নের গহন গভীরে। এসব বিজ্ঞান, কবিতা নয়, বুঝলে ?'

সৌরজগত সম্পর্কে সে এত জানে দেখে ও অবাক হয়ে গেল। নক্ষত্রপুঞ্জের কথাও সে বললো। বললো আমাদের পৃথিবীকে আলো দেয় যে সূর্য—সে ছাড়াও আরো অজস্র সূর্য, জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড, ধূমকেতু, মহাশূন্যে অসংখ্য বাতি-ঘর আর বিশাল সেইসব গ্রহ নক্ষত্রের কথা, যার কাছে আমাদের পৃথিবী ছোট্ট একটা খেলনার মতো। সৌরমণ্ডল সম্পর্কিত কেপলারের জটিল তথ্য-গুলোকে সে গুলিয়ে ফেলছিলো। একবার ভেবেও দেখলো না এর কতটুকু ও বুঝছে। তবু কিছুই এসে গেল না। শুদ্ধ বিস্ময়ে পলের হাতটা নিজের হাতের মধ্যে জড়িয়ে এস্টার নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছিলো। এই মুহূর্তে পলের মনে হলো কি নিবিড় ও তাকে ভালবাসে, যেন ওর হৃদয়ের সবটুকু রক্ত থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ছে কোমল প্রীতি।

'এই, পরে তুমি আমাকে ঐসব দেখাবে ?'

'নিশ্চয়ই।'

'তুমিও হয়তো একদিন কোন নতুন তারা আবিষ্কার করবে। আচ্ছা, তখন কি নাম দেবে ? আমার নাম। কেন, এরকম নাম বুঝি হতে পারে না ?'

'তুমি একটা দুষ্টু'—ওর মুখটা টেনে নিলো বুকের আরো কাছে। 'তোমার কি মনে হয় নতুন একটা গ্রহ আবিষ্কার করা খুব সহজ ? একটা মানুষের কত যুগ সময় কেটে যায় জানো...'

'ওটাকে কি বলে ওই যে মিট মিট করে জ্বলছে, ওই যে...দেখতে পাচ্ছো না ?' আকাশের দিকে আঙুল মেলে ও জিগেস করলো।

'ওটা অভিজিৎ, সপ্তর্ষিমণ্ডলের একটা বেশি তারা। সপ্তর্ষির দিকে তাকিয়ে দেখ, বুঝতে পারবে। এটা মারীচি, ওটা অত্রি, ওটা অঙ্গিরা, ওটা ক্রতু...'

'ঠিক বীণার মতো দেখতে।'

'কত যুগ আগে দেওয়া এইসব নাম, ভাবতো আমাদের চেয়ে কত বেশি ওদের কল্পনা শক্তি। সে যাই হোক, তুমি কখনো বীণা দেখেছো ?'

'না।'

'তাহলে তুমি জানলে কেমন করে ?'

'তুমি দেখেছো কোনদিন ?'

'সত্যি বলতে আমিও দেখিনি কোনদিন।'

'তাহলে তুমিই বা জানলে কেমন করে?' একই প্রশ্ন ফিরিয়ে দিয়ে দুষ্টুমী করে ছোট্ট একটা চুমু দিলো তার কপালে। তারপর প্রজাপতির মতো হাত-ছানি দিলো আকাশে, 'অভিজিৎ, এই যে সপ্তর্ষির নক্ষত্রপুঞ্জ, কেমন আছো? আমি এস্টার। অমন মিটমিট করে তাকাচ্ছো কেন? তোমার চেয়ে মানুষকে বোঝা অনেক সহজ, কেননা ওরা থাকে আমার অনেক কাছে, বুঝলে?'

দুহাতে এস্টারকে জড়িয়ে পল ওর ঠোঁটে ঠোঁট রাখলো। উঃ মেয়েটা কি যে বকতে পারে! তবু ভাবতে ভালো লাগলো, ও যা ছিলো তাইই আছে—একই ঝরঝর ঝরনার মতো অশান্ত চঞ্চল। তাছাড়া ওর কল্পনার বিন্যাসগুলো পরস্পর এমন সুসংলগ্ন বুঝি তাল রাখা যায় না।

'পল'—হঠাৎ সে শুনতে পেলো ওর মৃদু কণ্ঠস্বর। 'তারাদের ওপারে কি আছে?'

'তার মানে! তারাদের ওপারে তারা, অসীম আকাশ...'

'তারও ওপারে?'

'আরো আরো অজস্র তারা, অসংখ্য পৃথিবী আর ছায়াপথ...'

'সবশেষে ঈশ্বর?'

এ সম্পর্কে সে কোনদিনই কিছু ভাবেনি। দৃঢ় সংকল্প বহু বৈজ্ঞানিককেও এ নিয়ে বহু মাথা ঘামাতে হয়েছে।

'আমি ঠিক জানি না,' অনিচ্ছার ভঙ্গিতে কাঁধদুটো সে ঝাঁকিয়ে তুললো। 'এ সম্পর্কে আমি কোনদিন কিছুই ভাবিনি। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আমি মানি। আর বাকি যাকিছু সবই রূপকথা, বুঝলে? আচ্ছা, তুমি ঈশ্বর মানো? কি রকম তোমাদের ঈশ্বর! ইহুদী?'

'আমি ঠিক জানি না। মাঝে মাঝে মনে হয় ঈশ্বর আছেন। বেশ সুন্দর, মমতাময়। প্রায় বৃদ্ধ এমন একজন...যার কাছে দাবি জানানো যায়। কেউ যখন তোমাকে যন্ত্রণা দেয়, তোমার ওপর নির্যাতন করে, আর তুমি যখন জানো না কেন তারা তা করে...শুনতে হয়তো তোমার খুব খারাপ লাগছে, কিন্তু বিশ্বাস করো মাঝে মাঝে আমার মনে হয়—যদি আমি বিশ্বাস করি তাহলে আমার আরকোন ভয় করবে না। তিনি হয়তো একটি আঙুলের ইশারায় বলবেন: এস্টার, আমার সঙ্গে এসো, তোমার কোন ভয় নেই। তুমি তো আর আর্য নও, এ পৃথিবীতে তোমাকে কেউ চায় না।'

'আমি তোমাকে চাই, এস্টার।'

'আমি জানি তুমি চাও। তাছাড়া হয়তো এমনো হতে পারে সত্যিই কোন ঈশ্বর নেই। বাড়িতে আমরা এসব কোনদিন মানতাম না। বাবামণি শুধু এক-বার দাদুর শ্রাদ্ধের সময় ক্যাডিসে গিয়েছিলেন। নইলে তিনিও তোমার মতো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে বিশ্বাসী, আমিও তাই...জানো, আমার ভীষণ ভালো লাগছে যে তুমি এত সব জানো।'

'আর আমার ভালো লাগছে তুমি এখানে আছো বলে...' কেঁপে গেল গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস। দুবাহুর নিবিড়তায় পল ঢেকে দিলো ওর সারাদেহ। দু ঠোঁটের কোমল উষ্ণতা এখন ওর চিবুকে, গভীর অতল থেকে উঠে আসা শব্দ-গুলো যেখানে থমকে গেছে, সেই আরক্ত দুটি ঠোঁটে। যেন ভাষাহীন সংগীতের সুরে আচ্ছন্ন দুটি হৃদয়। যদিও আশ্চর্য সেই সুরমূর্চ্ছনা, তবু কেউ শুনতে পেলো না। উঠে গিয়ে জানলাটা সে বন্ধ করে দিলো। জ্বালিয়ে দিলো ছোট বাতিটা। ওর মুখ দেখার জন্যে সে চঞ্চল।

'বিশ্বাস করো এস্টার, তোমাকে পেয়ে আমি আশ্চর্য সুখী। হঠাৎ একটা তারা আবিষ্কার করেছি—আকাশে নয়, পার্কের অন্ধকারে। ভাবতেই কেমন লাগছে, তাই না? কিন্তু কোনকিছুই আমি আর পরোয়া করি না। জানি না নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে কোন তারাটা আমার খসে পড়লো। তুমি আমার প্রিয়তমা হবে, শুনতে পাচ্ছো? হয়তো আমি পাগলের মতো কি সব যাতা বকছি, তবু তুমি বিশ্বাস করো, তুমি আমার সবচেয়ে প্রিয়তমা বধূ হবে। তোমাকে ছাড়া এ পৃথিবীতে বাঁচতে আমার ভয় করে। যদি তোমার বাবামার সঙ্গে কখনো দেখা হয়, বললো—অসংখ্য ধন্যবাদ, এস্টারকে আমি ভালবাসি।'

সীমাহীন এই আবিল উচ্ছলতায় ওদের নির্জনতা যখন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছিলো, ওরা কল্পনাই করতে পারিনি—অন্ধকারের ওপারে, আলোয়, তীক্ষ্ণ একটা চোখ জানলা আর ফ্রেমের সংকীর্ণ ফাটল থেকে দৃষ্টি অনুসরণ করছিলো ঘরের ভেতরে। দেওয়াল থেকে চোখটা সরে এসে হঠাৎ থমকে গেল চেয়ারে রাখা এস্টারের কোটের হলুদ তারায়।

চোখদুটো হারিয়ে গেল।

ঘোরানো কাঠের জীর্ণ সিঁড়িতে প্রতিধ্বনিত হলো ভারি পায়ের শব্দ। তারপর সারাবাড়ি জুড়ে ফোঁটায় ফোঁটায় চুঁইয়ে পড়লো নিস্তব্ধতা।

৮

দেখ—পৃথিবীটা কি আশ্চর্য বদলে গেছে। সংকীর্ণ হয়ে এসেছে চার দেওয়ালের মাঝে। জীর্ণ একটা ছাদ, ধূসর মেঝে। জানলার ওপারে মানুষের মুখর পৃথিবী, আর একটুকরো নগ্ন আকাশ। ঘন্টার পর ঘন্টা ক্লান্তিহীন অপলক চোখে এস্টার আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। দু একটা গাংচিল উড়ছে নিঃসঙ্গ আকাশে। দূরে ভাঙা টালির জীর্ণ একটা ছাদ, যেন কোন অদৃশ্য দৈত্য তার বিশাল পায়ে ছাদটা মাড়িয়ে দুমড়ে দিয়ে গেছে। পেছনে দুটো বাদাম গাছ, ডালপালাগুলো তার ছড়িয়ে পড়েছে ছাদের কিনারে। জানলার খুব কাছে যেতে ওর ভয় হয়, যদি কেউ দেখে ফেলে।

এই ওর পৃথিবী। এখানেই সারাদিন ও বন্দী পাখির মতো ছটফট করে।

দূর থেকে ভেসে আসে নানান কণ্ঠস্বর। কখনো ও বুঝতে পারে ওরা কি বলছে, কখনো শুনতে পায় অসংলগ্ন কাটাকাটা টুকরো কথার সংলাপ, বারান্দায় বিতর্কের ঝড়, বালতিতে জল পড়ার টিপ টিপ শব্দ। ওখানে কে জানে কার পায়ের শব্দ। দিনের বেলায় পেছনের ঘর থেকে ঝিঁঝিঁর ডাকের মতো একটানা ভেসে আসে সেলাই মেসিনের শব্দ। পরিচিত নানান কণ্ঠস্বর। এখন ও কণ্ঠস্বরে সবাইকে আলাদা আলাদা করে চিনতে পারে।

তারপর পায়ে পায়ে সন্ধ্যে নামে। দূরে কোথাও অন্ধকারের ওপার থেকে ভেসে আসে হাতুড়ির শব্দ, বিষণ্ণ করুণ একটানা গীটারের সুর। ঘুম ভেঙে ককিয়ে ওঠা শিশুর কান্নায় ওর চোখ ফেটে জল আসে। রাত্রির নিস্তব্ধতায় দেওয়ালের ওপার থেকে শোনা যায় ঘড়ির ঢং ঢং বেজে চলা ঘন্টার বিচিত্র ধ্বনি। কাছেই কোথাও ইঁদুরের খশ খশ শব্দ। শব্দগুলো ঘরের এক কোণে এসে শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভীরু খরগোশের মতো ও কান পেতে শোনে। প্রথম প্রথম মনে হতো সীমাহীন এই নিস্তব্ধতায় ও বুঝি পাগল হয়ে যাবে। পলের আনা বইটা নিয়ে মাঝে মাঝে ও পড়তে বসতো, সে শুধু মুহূর্তের জন্যে। তারপরেই লাইনগুলো ওর চোখের সামনে তিতিরের মতো নাচতে শুরু করে দিতো। নিজের বিষণ্ণ জীবনের ভাবনা যেখানে সীমাহীন, তখন অন্যের ভাবনা ও কেমন করে ভাববে। একরাশ ক্লান্তিতে আনত হয়ে আসে চোখের পাতা। মাঝে মাঝে ওর মনে হতো ছোট্ট ঘরটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলে, কিন্তু সে তো এমন একটা কিছু কঠিন নয়। রোজই ও নিঃশব্দে তা করে রাখে।

তাছাড়া আর কিই বা করার আছে ? শুধু চুপচাপ একা বসে বসে সময়ের ঢেউ গোনা। তবু ঠোঁটে ঠোঁট চেপে নিঃশব্দে ও বসে থাকে, ও চায় না তার জন্যে পলের কোন কষ্ট হোক। বাইরে বেলা শেষের রোদ ডুবে গেলে চোখ মুছে ও চুল বাঁধে, তারপর উজ্জ্বল শান্ত মুখে তাকে স্বাগত জানায়।

'নতুন কিছু ?'

'নতুন কিছুই নেই, সম্রাট...' সৈনিকের মতো বুক টানটান করে এস্টার দাঁড়ায় তার সামনে। ঠোঁটে দুষ্টুমির হাসি।

'বাঃ বেশ !' একই ভঙ্গিতে পলও ওকে ফিরিয়ে দিলো প্রত্যাভিবাদন। 'এবার ঠিক হয়ে দাঁড়াও। কিন্তু তার আগে কিছু খেয়ে নাও। নিশ্চয়ই তোমার খুব খিদে পেয়েছে ?'

এস্টার মাথা নাড়লো। চুলগুলো ছড়িয়ে পড়লো কাঁধের চারপাশে। খিদে পেলেও ও কখনো স্বীকার করে না।

'মিথ্যে কথা। আমি জানি তোমার খিদে পেয়েছে। তুমি তো একটা মেয়ে, না আকাশের পরী ?' খাবারগুলো সে রাখলো টেবিলের ওপর। আর ও আনত লজ্জায় খাবারটা নিঃশব্দে টেনে নিলো কোলের কাছে।

'এই জানো,' গাল ভরা মুখে ও বললো, 'ভাবতেই কেমন আশ্চর্য লাগছে, সত্যিই যদি কোন অনার্য পরী থাকতো ?'

'ফের দুষ্টুমি !' খাবারের খালি বাক্সটা পল ব্যাগে ভরে রাখলো। 'জানি এতে তোমার কিছুই হলো না। কিন্তু এর চেয়ে বেশী সংগ্রহ করতে পারলাম না, বিশ্বাস করো, সত্যিই আমি দুঃখিত।' বাকিটা সে বেদনার ম্লান হাসিতে ভরিয়ে দিলো।

হাতের পেছন দিয়ে এস্টার মুখ মুছলো, তারপর পলের কপালে ছোট্ট একটা চুমু দিলো।

সেদিন পল বগলে করে লম্বা সরু মতন একটা বাক্স নিয়ে এলো। চলার সময় খড় খড় করে শব্দ হচ্ছিলো। সারা মুখে তার রহস্যময় অভিব্যক্তি।

'এই, এতে কি আছে ?' কণ্ঠস্বরে ওর স্তব্ধ বিস্ময়।

পল মুখে কিছু বললো না, শুধু গোপন ভঙ্গিতে ঠোঁটে আঙুল রাখলো। তারপর সাপলুডোটা ওর সামনে পেতে ঘুঁটি সাজালো। তোমার লাল, তুমি আগে খেল। উচ্ছল খুশীতে এস্টার ভরে উঠলো। বাচ্চাদের এই খেলাটা ও

ভালো করেই জানে, বাড়িতে বাবামণির সাথে খেলতো। ছকা ঘুরছে, এগিয়ে চলেছে ঘুঁটি। পৃথিবীটা মুছে গেছে ওদের সামনে থেকে। এস্টারের ঘুঁটিটা ওপরে উঠে সাপের মুখ থেকে আবার নিচে নেমে এলো। তুমি ভীষণ দুষ্টু। না না, ঠিক গোনা হয়নি। দাঁড়াও, আচ্ছা ঠিক আছে। দেখো না আমিও জিতবো...ছকা পড় একটা, ঈশ্ তিন। অভিমানে ঠোঁট দুটো ওর ফুলে উঠলো। চুলগুলো কপালের ওপর থেকে সরিয়ে শিশুর মতো অমিত উৎসাহে ও আবার খেললো। যখন কিছুই হলো না, লুডোর ওপর ঘুঁটিগুলো সব ছড়িয়ে দিলো। সারা মুখে আহত অভিমান। পল হেসে ফেললো। যখন আদর করে কাছে টেনে নিতে গেল, ও বাধা দিলো। মেয়েদের যত রকম চালাকি সবই ব্যবহার করলো। পলও শুনলো না।

'বেড়ালের মতো আঁচড়াচ্ছো কেন, দুষ্টু কোথাকার?' হাতদুটো ওর চেপে ধরলো। এস্টারও নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো, পারলো না।

'না না, আমি খেলবো না। তুমি একটা দুষ্টু।'

'না খেললে তো বয়েই গেল,' ঠোঁটে তার বিজয়ীর হাসি।

ছোট্ট মেয়ের মতো এস্টার তাকে জিভ ভেঙালো। চুলগুলো সরিয়ে নিলো মুখের ওপর থেকে। তারপর কি যেন ভেবে ছকাটা তুলে নিলো।

'দুষ্টু কোথাকার,' মিষ্টি হেসে পল ওর মুখটা টেনে নিলো বুকের কাছে। 'হেরে গেছ বলে রাগ করেছো? জানো, সবকিছুই আসে কয়েকটি দিনের শেষে...'

চকিতে দুবাহুর নিবিড়তায় এস্টার পলের গলাটা জড়িয়ে ধরলো, চলকে ওঠা উচ্ছলতায় টানাটান করে মেলে দিলো ওর সারা দেহ। সত্যিই, সবকিছু আসে কয়েকটি দিনের শেষে। নইলে কিসের জন্যে বাঁচা। সে যখন এখানে ওর কাছে থাকে, নিবিড় দুহাতে জড়িয়ে আদর করে, এলোমেলো করে দেয় ওর চুল—ওর ভালো লাগে। কিন্তু পল যখন থাকে না, চার দেওয়ালের রুদ্ধতায় নিঃসীম ঘৃণা ছাড়া ও আর কিছুই অনুভব করতে পারে না। মাঝে মাঝে পালিয়ে যাবার দুর্মর ইচ্ছা ওকে পেয়ে বসে। কি আর এমন শক্ত। দরজাটা খুলে শুধু ছোটা, ছোটা আর ছোটা। রৌদ্রস্নাত শ্যামলী পৃথিবীর যেখানে খুশী, চারদিকে খোলা আকাশ আর অজস্র মানুষ। তার মধ্যে থেকে বাবা-মণিকে শুধু খুঁজে বার করা। কিন্তু ওঁরা এখন কোথায়? হয়তো তার জন্যে কোথাও অপেক্ষা করছেন, আর সুন্দর সুন্দর সব চিঠি লিখছেন, যে চিঠি এখনো

ওর কাছে এসে পৌঁছয়নি। আঃ এই মুহূর্তে, পার্কের কোন থেকে অন্ধকার গুঁড়ি মেরে উঠে আসার আগেই যদি এক ছুটে বাড়ি পৌঁছনো যেতো! কিন্তু ওদের বাড়িটা এখন কোথায়? ভাবতেও বুঝি ভয় হয়। এমন একটি মুহূর্তের অরতপ্ত উত্তেজনা বুকে নিয়ে ও কেমন করে বাঁচবে, যখন দরজায় শুনবে প্রচণ্ড লাথির শব্দ, আর ধীরে ধীরে দরজাটা খুলে যাচ্ছে। কালো শিরস্ত্রানের নিচে বীভৎস কয়েকটি মুখ, লুকনো বিদ্যুতের মতো ক্রুর হাসি, অন্ধকারেও চোখ-গুলো শিকারী হায়নার মতো ধক্‌ধক্‌ করে জ্বলছে।

জানলার সামনে দাঁড়িয়ে পল সাবধানে একটা সিগারেট ধরালো।

'তোমার বেশিদিন এখানে থাকা উচিত নয়। দিন দিন তুমি কেমন বিবর্ণ হয়ে উঠছো। সূর্যের আলো তোমার প্রয়োজন। কি ব্যাপার, কথা বলছো না যে?'

'আগে বলো, আজ তুমি একবারও ঘড়ির দিকে তাকাবে না?'

'না। এমনি অভ্যেস হয়ে গেছে...'

'দেখে মনে হয় তুমি যেন সব সময়ই চলে যাবার জন্যে ব্যস্ত।'

'ও কথা কেন বলছো? মোটেই তা নয়।'

'জানো পল, মাঝে মাঝে মনে হয় আমার যদি একটুও কাণ্ডজ্ঞান থাকতো আর তোমাকে যদি এত নিবিড় করে ভাল না বাসতাম, তাহলে আমি ঠিক চলে যেতাম।'

'তুমি কি পাগল হয়েছো এস্টার? যদি জানতে বাইরে এখন...'

'বাইরে কি?'

'কিচ্ছু না, আগে একটু শান্ত হও তো। তুমি কিচ্ছু ভেবো না, যা ভাবার আমি ভাববো। আর কয়েকটা দিন, তারপর দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে '

এমনই মুহূর্তে পল ওকে টেনে নেবে বুকের আরো কাছে। নিবিড় দুহাতে জড়িয়ে আদর করবে, যেন সবটুকু ভালবাসা ঢেলে দিতে চাইবে ওর গভীর রক্তস্রোতে। কোমল স্নিগ্ধতায় মুদে আসবে ওর চোখের পাতা। আর নিবিড় আলিঙ্গনে ওর ছোট্ট কামনাটুকু আত্মহারা পাগলের মতো উঠে আসবে বুকের নিচে। ঠিক ওইখানে যদি হারিয়ে দিতে পারতো নিজের সবটুকু স্মৃতি, যন্ত্রণার সমস্ত রঙ, যেখানে তার শেষ ওর শুরু! কিন্তু এখন কেমন করে ওকে এখান থেকে নিয়ে চলে যাবে?

তারপর দরজা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই একই নিঃসঙ্গতা।

এস্টার শুয়ে। ঘুম চোখ অথচ ঘুম নেই। বাঁশির সুরের মতো একরাশ ক্লান্তি জড়িয়ে রয়েছে ওর সর্বাঙ্গে : সবকিছুই কেমন যেন এলোমেলো, বিষন্ন ম্লান। দিন আর রাত—কত যে পার হয়ে গেল। হৃদয়ের স্পন্দন বুঝি থেমে আসে, থেমে আসে ধমনীর প্রতিটি রক্তস্রোত। শুধু শৈশবের প্রগলভ স্মৃতি-গুলো এখনো মুখর, যেন আলাউদ্দীনের সেই আশ্চর্য প্রদীপ। অথচ এর আগে জীবন সম্পর্কে ও কতটুকুই বা ভেবেছে।

ওখানে সবাই ছিলো, বাবামণি আর মামণি। ওদের ছোট শহর, স্কুলের শোকেসে সাজানো পেঁচা আর বাদুড়, ট্রোনিসেকের শালুক ফোটা সেই ঝিল, আর ওদের বাগানে বকুলের শাখায় বাঁধা সেই দোলনা। বাবামণির তৈরী মৌচাক—গ্রীষ্মকালে গুনগুন করে এমন মিষ্টি গান গাইতো। সার্জারী রুমে সাবান আর ডেটলের ঝাঁঝালো গন্ধ, বিস্ময়ের রাজ্যে ছোটদের সেখানে যাওয়া বারন। ওয়েটিং-রুমে কালো ওকের আসবাব, টেবিল-ক্যালেণ্ডার, দেওয়ালে টাঙানো ডাক্তারের সাথে বাচ্চা একটা মেয়ের নগ্ন ছবি। ডাক্তারের ছবিটা তরুণ, একটুও বাবামণির মতো দেখতে নয়। তবু যখনি ও ছবিটার দিকে তাকাতো বাবামণির জন্যে বুকটা ওর ফুলে উঠতো। সুদূর গ্রাম থেকে লোকেরা কাদা মাখা পায়ে এসে অপেক্ষা করতো, গায়ে তাদের ঘামের গন্ধ।

অজস্র মুখ, শব্দ আর কণ্ঠস্বর। ঘরের ভেতরে বেজে উঠছে কলিং-বেল। গেটের সামনে বাবামণি কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। কখনো বা ফিরছেন দূরের গ্রাম থেকে, শক্ত হাতে স্টেয়ারিংটা ধরে আছেন। ঝরঝরে ছোট গাড়িটা লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে আসছে, চারিদিকে ছিটকে পড়ছে কাদা। বাড়ির ভেতরে উনি যখন হাত ধোবার জন্য ব্যস্ত, ও তখন বাইরের পৃথিবী দেখছে। বসন্তের পাখিরা ফিরে আসছে নীড়ে। দরজার সামনে আসন্ন প্রসবা নারীর চাপা আর্তনাদ, যন্ত্রণায় ভেজা নীল চোখ। সাইকেল চড়ে কে যেন এলো, সারা পায়জামা তার কাদায় ভর্তি। বাবা এলেন, মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। ছোট গাড়িটা আবার রাগে গরগর করতে করতে মাঠের মধ্যে নেমে গেল। তারপর তিনি যখন ফিরে এলেন, মহিলাটি জন্ম দিয়েছে ছোট্ট একটা শিশুর। আচ্ছা, জন্মের সময় খুব কষ্ট হয়। ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে।

ও তখন তেরো। অন্তরঙ্গ বন্ধু জেনি আর ও, দুজনে মামণিকে কোনরকমে রাজি করিয়ে চুল কেটেছিলো। ষড়যন্ত্রটা খুব ছোট হলেও গোপনীয়তা রাখতে হয়েছিলো যাতে বাবামণির চোখে না পড়ে। তারপর থেকেই ও তন্বী। সহসা

কৈশোরের প্রান্ত সীমা থেকে যৌবনে পা দেওয়া। পীনোন্নত বুকে ছোট্ট দুটো স্তনাভাস। হঠাৎ এই পরিবর্তনে ও অপলক। এখন সমস্ত অবয়ব,শিরার প্রতিটি রক্তস্রোতে শুধু নিঃসঙ্গ ভেসে যাওয়া। একান্ত নিজের পৃথিবীতে ও কখনো মুখর, কখনো খিলখিল মেয়েলি হাসি, কখনো বা মুঠোর মধ্যে ভাজকরা রুমালটা চেপে নিঃশব্দে শুধু হেঁটে যাওয়া। এখন কোথায় যাওয়া যায়? অজানা একটা ভীতি। কি যেন ছেলেটার নাম, জিরোমি। সবাই ডাকে জিম বলে। আশ্চর্য স্বপ্নময় ছেলেটির চোখ দুটি।

কোথা থেকে যেন এর শুরু। ট্রোনিসেকের মাঠে ও ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর গুন গুন করে নাচের একটা গান গাইছে। হঠাৎ পুকুরের পাড়ে চোখ পড়তেই ও থেমে গেল। গাছের গায়ে হেলান দিয়ে সে দাঁড়িয়ে। তন্ময় দুটি চোখ, ঠোঁটের কোণে নিঃশব্দ একটুরো হাসি। তার দিকে তাকিয়ে এস্টার ভেবেই পেলো না হাত দুটোকে নিয়ে করবে। কানের পাশ দুটো উত্তপ্ত। চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। দৌড়ে পালিয়ে আসবার আগে তাকে জিব ভেঙাবার অবকাশ ও পেয়েছিলো। অবশ্য এখানেই গল্পের শেষ নয়। তারপর আরো কয়েকবার তাকে দেখেছে বাড়ির কাছে। জানলার সামনে গল্পের বইটা পড়তে পড়তে মনে হয়েছিলো ও ভিক্টোরিয়া, আর সে যেন গল্পের নায়ক সেই শিকারী— সুন্দর নীল দুটি চোখ, কোঁকড়ানো চুল, আর শন শন পালকের তীরে সে কি অব্যর্থ লক্ষ্য। সেদিন হঠাৎ টেবিলে ছোট্ট একটা চিঠি পেলো : তোমাকে আমি ভালবাসি, বন্ধু হতে যদি একান্ত আপত্তি না থাকে, কাল বিকেলে সেই মাঠের ধারে এসো, আমি অপেক্ষা করবো। প্রচণ্ড রাগে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেললেও সেদিন না গিয়ে ও পারেনি।

তারপর হঠাৎ একদিন ঝড় কাঁপিয়ে এলো যুদ্ধ।

হঠাৎ নয়, তবু এছাড়া এস্টারের আর কিছুই মনে হয়নি। সেদিন সারা পথ জুড়ে জার্মান ট্রাকে ভরে গেল ওদের ছোট শহর। তাঁবু পড়লো অরণ্য প্রান্তরে। প্রথম বসন্তের মাটি তখনো শুকিয়ে ওঠেনি। তরল কাদার মধ্যে দিয়ে নিঃশব্দে ওরা হেঁটে চললো। দিন গেল। কিছুই বুঝতে পারলো না, শুধু বাবামণির বিবর্ণ মুখ দেখে কেঁপে উঠলো ওর বুক। কি হয়েছে বাবামণি? কই কিছুতো হয়নি সোনা। ওঁরা কেন তার কাছে এমন করে গোপন করছেন। তারপরেই সবকিছু সহসা দ্রুত ঘটে গেল। ওর নাচ শেখা, স্কুল যাওয়া বন্ধ। শুধু অবাক চোখ মেলে চেয়ে দেখা, আর নিঃশব্দে অনুভব করা—অন্য মানুষের চেয়ে

ওরা ভিন্ন। ও যে ইহুদী। অসংখ্য ইহুদী পরিবার দূরে কোথায় যেন চলে গেছে। আর তাদের সেই পরিত্যক্ত বাড়িতে রাতের অন্ধকারে কারা যেন নিঃশব্দে ঘুরে বেড়িয়েছে—সেইসব অজানা মানুষ, যারা ইহুদীদের ঘৃণা করে। ওরা চলে গেল কেন বাবামনি? হয়তো আমাদেরও একদিন চলে যেতে হবে। না এস্টার, আমরা এখানেই থাকবো। এ যে আমাদের ঘর।

ও জানতো বাবামণির অনেক বন্ধুরা চেয়েছিলেন তিনি এখান থেকে চলে যান। কিন্তু তিনি ছিলেন পাহাড়ের মতো অটল। একদিন বড় ভাই ক্যামিল এসে বিদায় জানালো। সে ছিলো বিজ্ঞানের ছাত্র। ক্লাস থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। চোখ দুটো জলে ভেজা। তারপর সেও যেন কোথায় চলে গেল, কেউ জানলো না। তখনি ওর মনে হলো—জিম নিশ্চুপ, জেনি এত কম আসে কেন। যদি কখনো আসে, আসতো সন্ধ্যার অন্ধকারে পেছনের দরজা দিয়ে চুপি চুপি। বাগানে দোলনার কাছে দুজনে পাশাপাশি বসতো, গল্প করতো। কাঁদিস না রে, দেখিস একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখ, আমি কি কাঁদছি? তারপর তোর স্কুলের খবর কি বল? আর নাচের? তোর সঙ্গে কে ভালো নাচেরে? আমার ফ্রকটা দেখবি?

শূন্যতা। যখনি ও নিঃসঙ্গ একা থাকে, চারদিক থেকে অজস্র শূন্যতা হাঁ-মুখ দুঃস্বপ্নের মতো ছুটে আসে। যদিও ছোট্ট এই শহরের প্রায় সবাই ওদের ভালবাসে, বন্ধুর মতো ব্যবহার করে। গরীব মানুষেরা ভোলেনি তাদের ডাক্তারকে। সবসময়ই তারা সহযোগিতা করেছে, অন্তরঙ্গতার উষ্ণ স্পর্শ রেখেছে। তবু শুধু সমবেদনায় ভরেনি সেই অতল শূন্যতা। দুরন্ত ঘোড়সওয়ারের মতো দ্রুতপায়ে ছুটে এসেছে অজস্র আইন। করুণায় ভিজে উঠেছে সেইসব মানুষের চোখের পাতা, যারা আজো তাদের ভালবাসে। তবু ওর মনে হয়েছে এই করুণাই বুঝি ওদের টেনে নিয়ে চলেছে নরকের অতল অন্ধকারে। রাত্রিদিন এ এক দুঃসহ যন্ত্রণা। বাবামণি, কেন কেন কেন ওরা শুধু আমাদের এমন করে করুণা করবে, কি করেছি আমরা। মামণিই শুধু এর ব্যতিক্রম। নিঃশব্দে তিনি কোটের বুকে কাজ করে চলেছেন হলুদ তারার। অনেকেরই কৌতুহলী দৃষ্টি ওদের সেই ছোট ঘরটায়। অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সতর্কবাণী, যাদের উপাস্থিতিকেও এড়িয়ে চলতে চায়। কখনো দেখা হলে মনে হয় ও যেন অন্য কেউ, অপরিচিতা। পাশ থেকে কে যেন ফিসফিস করে বলে উঠতো 'হলো!'

স্মৃতি থেকে ও কেমন করে মুছে ফেলবে সেইসব মুখ। অসংখ্য মুখ, কটাক্ষে

আবিল হাস্য, বিদ্রূপের স্খলিত বিদ্যুৎ—ইহুদী। ইহুদী! কারা যেন পাগলের মতো চিৎকার করে ছুটে আসছে ওর দিকে। আর ও ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে বাবামণির দুবাহুর মাঝে। বাবামণি ওকে জড়িয়ে ধরেছেন বুকের মধ্যে। তবু অশ্রুসিক্ত কি এক আশ্চর্য যন্ত্রণায় ভেঙে আসছে চোখের পাতা—কেন বাবামণি, আমরা কি করেছি ওদের? আমি যাবো, আমি যাবোই। তবু তিনি কিছুই বলেনি, আকাশের মতো স্তব্ধ, যেন এ পৃথিবীতে উনিই সবচেয়ে নিঃসঙ্গ। না এস্টার, তা হয় না, আমরা যে ইহুদী। কেঁদো না লক্ষ্মীটি, শোন…

এস্টার চোখ মেললো। এ আমি কোথায়? ওর মনে পড়লো। পেছনের উঠোন থেকে তখন গুঁড়ি মেরে উঠে আসছে আর একটা সন্ধ্যা। কে যেন মিষ্টি শিস দিতে দিতে বারান্দার পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। সোফার ওপর তখনো ও শুয়ে। খিদেয় কেঁপে কেঁপে উঠছে সারা শরীর। পল! আঃ কখন যে সে আসবে?

বাবামণি! তিনি ওর ওপর ঝুঁকে পড়েছেন। বিশীর্ণ একটা হাত কেঁপে কেঁপে হারিয়ে যাচ্ছে ওর চুলের গভীরে! তিনি নিশ্চুপ। কথা বলছো না কেন? কি করেছি আমরা? অন্ধকারে ও যেন স্পষ্ট দেখতে পেলো বাবামণির বিবর্ণ মুখ, ধূসর ম্লান চোখ, হলুদ তারাওয়ালা সেই জীর্ণ কোট—যেন সারা-দিনের অজস্র ক্লান্তি মাখা বিষন্ন একটি দেহরেখা! অথচ সেই একই বাবামণি যাঁর উদাত্ত হাসিতে হৃদয় মুখর হতো, রোজ সন্ধ্যায় আলো জ্বেলে যিনি ওয়া-ল্টজের সুর শেখাতেন। আর ব্লাঙ্কা, ওর নতুন পাওয়া সেই বান্ধবী, হলুদ তারার একই হতভাগ্য মেয়ে। মামণি শুধু গোপনে চোখের জল মুছতেন। বাড়ির চারদিকে সেই চাপচাপ অন্ধকার, তবু সব শেষেও ওরা সেখানে এক-সঙ্গে ছিলো।

নির্বাক চোখের পাতা থেকে শুধু ঝরে যাওয়া কয়েকটি দিন, কয়েকটি মাস। এ আমি কোথায়? এ যেন স্বপ্ন! বৃষ্টির দুঃস্বপ্ন আর দুচাকার সেই টানা গাড়ি...খোয়া-ওঠা রাস্তার বুকে ঘড়ঘড় শব্দ, বাবামণি গাড়িটা টানছেন, ও আর মামণি, দুজনে পাশাপাশি গেট পর্যন্ত হেঁটে এলো। তখনো অঝরে বৃষ্টি ঝরছে। এখানেই ওঁদের বিদায় জানাতে হবে। অজস্র মানুষের নিঃশব্দ মিছিল, পেছনে চলমান সংসারের যাবতীয় সঞ্চয়, বৃষ্টিতে ভিজে একাকার। অঝর বৃষ্টির মধ্যে সমস্ত পৃথিবী যেন গলে গলে পড়ছে। বেশীক্ষণ এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব। আরো অজস্র মুখ, দুচাকার টানা গাড়ি, হাতে সুটকেস,

ফেলে আসা স্মৃতি আর কোটের বুকে হলুদ তারা—নারী পুরুষ আর শিশু, হাসি অশ্রু আর বৃষ্টি, ঝাপসা কুয়াশার মধ্যে ক্লান্ত দেহ টেনে চলা সেই বৃদ্ধ, দুচোখে ভয় জড়ানো ছোট্ট একটি মেয়ে, হাতে তার আঁকড়ে ধরা খেলার পুতুল—নগ্ন পা বিষণ্ণ নারী, ভেঙে পড়া চূর্ণ কুন্তল আর অসংখ্য বৃষ্টির ফোঁটা, শব্দ স্খলিত বিলাপ আর সরকারী ছাড়পত্র ; জানলা, ভিজে বাড়ির দেওয়াল, বৃষ্টির টুপটাপ শব্দ আর অজস্র চোখ। ফিসফিস করে বাবামণি কি যেন বললেন আর রুমালে কপাল থেকে ঘাম মুছলেন। টুপির প্রান্ত থেকে তখনো ঝরে পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটা। ওরা যখন মামণিকে চুমু দিলো, তখন তিনি আর ধরে রাখতে পারলেন না চোখের জল। ছোট্ট সোনামণি আমার। বাবামণি, তাঁর কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হলো ওর অস্ফুট কণ্ঠস্বর —কেন বাবামণি, কি করেছি আমরা ? কিছু না সোনামণি, কিছুই করিনি আমরা। যা ছিলাম তাইই আছি। অন্ধকারাচ্ছন্ন এ যেন সেই আদিম অরণ্য উল্লাস, বুঝলে না এস্টার। এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা মানে...কেঁদো না লক্ষ্মীসোনা। চিঠি লিখো। দেখো আমরা আবার ফিরে আসবো, বাগানে ঘুরে বেড়াবো...আমরা তো আর অপরাধী নই। তুমি দেখো, কয়েকদিন পরেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। না বাবামনি, আমি যাবো। আমাকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাও...আমি এখানে একটুও থাকতে চাই না। এখানে আমার ভীষণ ভয় করবে...

দুচাকার গাড়িটা তখন একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছে জনসমুদ্রে, বৃষ্টির ঝাপটায় ভিজে উঠছে ওর সারা শরীর। বাবামণি! বিদায় এস্টার, টেরাঝিনে শিগ্রি আবার আমাদের দেখা হবে, সোনামণি আমার। বাবামণি! বাবামণি! ভীরু কণ্ঠস্বর হিমেল বাতাসে প্রতিধ্বনিত হবার আগেই ও তাদের হারিয়ে ফেলেছে। চারিদিকে শুধু অগণিত মানুষ, মানুষের সমুদ্র।

চকিতে ঘুম ভেঙে এস্টার সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালো। তারপর দুহাতে চোখ মুছে জানলাটা বন্ধ করে দিলো, জ্বেলে দিলো ঘেরা-টোপের ছোট্ট বাতিটা। এখুনি চুল বেঁধে পরিষ্কার হতে হবে। ঈশ্‌, কি যে ছিরি হয়েছে! আয়নায় মুখ রেখে মনে মনে ভাবলো, সংকুচিত হয়ে উঠলো নিজেরই মনে। স্নানের এতটুকু সুযোগ নেই, উপায় নেই জামা ব্লাউজ কাচার। সারাদিন অসহ্য গরম, অথচ কোথাও এতটুকু হাওয়া নেই। বাতাস ভুলেও পা বাড়ায় না বন্দী খাঁচায়। সারা শরীর ঘামে ভেজা, কি বিশ্রী। সব মেয়েরাই চায় তাদের প্রিয়-

ওদের কাছে নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে, শুধু আমিই পারি না। আমিই পারি না তাকে অবাক করে দিতে। এরকম বিশ্রী দেখতে হওয়ার চেয়ে পাগল হয়ে যাওয়া ঢের ভালো। আয়নাটা ও মুখের সামনে তুলে ধরলো। চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে মনেহলো এ যেন অন্য কারুর মুখ, নিদ্রাহীন চোখের পাতায় কি অজস্র ক্লান্তি।

মুহূর্তের জন্যে বন্ধ করলো চোখের পাতা।

না না, এ মুখ আমার নয়। এ মুখ আমার হতে পারে না।

যখন চোখ খুললো, ছাদটা নেমে এসেছে অনেক নিচে। ঠিক মাথার ওপরে। বুঝি এখনি ভেঙে পড়বে। দরজার দিকে ও ছুটে গেল। না, যেমন ছিলো ঠিক তেমনিই আছে। ও জানে কেন এমন হলো। নির্লজ্জ ক্ষুধা হানছে চাবুক। সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে যেন অজস্র অশ্বারোহী ছুটে চলেছে মাথার মধ্যে। শিথিল হয়ে আসছে সারা দেহ। ক্ষুধার রাজ্য জুড়ে চাবুকের শনশন শব্দ।

কিন্তু এখনো পল এলো না কেন?

বারান্দার সামনের দরজায় ও কান পেতে শুনলো, যেন রাস্তার ধারে টেলিফোন পোস্টে কান পেতে শব্দ শোনা ছোট্ট একটা মেয়ে। নিস্তব্ধতার প্রলুব্ধ একটি কামনা! চলে যাবে, পালিয়ে যাবে কোথাও। মুহূর্তে মনে হলো এমনি করে একদিন দাঁড়াবার শক্তিটুকুও হারিয়ে যাবে, তখন আর চলে যেতে পারবে না, ঝরা পাতার মতো নিজেকে ঢেকে লুকতে পারবে না এ পৃথিবীর কোথাও। সহসা আদিম একটা কামনা ভেতর থেকে গুড়ি মেরে উঠে এলো বুকের কাছে। নেহাইয়ের বুক থেকে উঠে আসা হাপরের মতো কেঁপে উঠলো সারা শরীর। তাহলে কি এখুনি!

হাতলটা ঘুরিয়ে দিলো। এত সহজে দরজাটা খুলে যেতে দেখে ও ভয় পেলো। স্বল্পালোকিত বারান্দায় সবুজ বাতিটা ওর চোখের সামনে মিটমিট করে জ্বলছে। বিশ্রী ভ্যাপসা একটা গন্ধ। দূরে কোথায় যেন দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ। বালতিতে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ার টুপটাপ শব্দ। হঠাৎ কাঠের সিঁড়িতে প্রতিধ্বনিত হলো কার যেন ভারি পায়ের শব্দ। এ বাড়ির প্রতিটি পায়ের শব্দ ওর জানা, প্রতিটা মানুষ যাদের মুখ ও কখনো দেখেনি। পলের নয়, তার পায়ের শব্দ যেন ওর জন্মের প্রথম থেকেই চেনা। সে হয়তো আজ আদৌ আসবে না, কাল কি যেন বলছিলো।

ব্যর্থ একটি সন্ধ্যা।

পায়ের শব্দটা আরো কাছে প্রতিধ্বনিত হলো। চকিতে ঘরের মধ্যে এসে দ্রুত হাতে দরজাটা ও বন্ধ করে দিলো। ভয়ে বুকের ভেতরটা তখনো থর থর করে কাঁপছে। পায়ের শব্দটা পাশ দিয়ে চলে গেল। ওর বুকের অতল থেকে উঠে এলো গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস। আঃ পল যদি হঠাৎ এরকম এসে পড়তো!

হয়তো সে আসবে একটু পরেই।

অন্ধ দরজার কাছে গিয়ে ও চাবিটা ঘুরিয়ে দিলো। তারপর গিনিপিগের মতো সহজ ভঙ্গিতে গলে গেল দর্জির দোকানের নিতল অন্ধকারে। অন্ধকারেও এখানের সব পথ ওর জানা। সেলাই মেসিন আর কাঠের ডামি এড়িয়ে ঘরের এক কোণে ওয়াসবেসিনের কাছে এসে অন্ধকারেই কলটা খুলে দিলো। তারপর ব্লাউজটা খুলে ফেললো। নগ্ন পেলব বাহু বেয়ে নেমে এলো স্বচ্ছ জলের ধারা। দুহাতের অঞ্জলিভরা জলে ও মুখ ডুবিয়ে দিলো। ছড়িয়ে দিলো কাঁধে, গলার পেছনে, চুলে। আঃ এত ভালো বুঝি এর আগে আর কখনো লাগেনি!

হঠাৎ টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলে উঠলো। তীব্র আলোর বন্যায় বুজে এলো ওর চোখের পাতা। যখন খুললো, ভয়ে চিৎকার করে উঠলো। সারা মুখ ওর বিবর্ণ পাংশুল। চকিতে ভিজে তোয়ালেটা চেপে ধরলো খোলা বুকের ওপর।

'হুঁ, এতক্ষণে বুঝিলাম!'

ওর খুব কাছাকাছি দরজার সামনে কে যেন দাঁড়িয়ে। চশমার ফাঁক দিয়ে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওকে দেখছে। পরিচিত একটি কণ্ঠস্বর। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়া বিশাল একটা দেহ, টাক মাথা। সরল অথচ দীর্ঘ টানা একটুকরো হাসি। এ যেন পরীর দেশের রহস্যময় সেই দৈত্য।

'তারপর কোথা হতে আসিলে, হে সুন্দরী?'

ও কিছুই বললো না, ভয়ে দাঁতে দাঁত চেপে নিশ্চুপ। শুধু বুকের ওপর তোয়ালেটা চেপে তার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো।

'তাহলে এইখানে রাতের অন্ধকারে ঘুরে বেড়ানো তুমিই সেই অশরীরিণী?'

ঠোঁটের প্রান্তে তার বিচিত্র হাসি। 'বহুদিন তোমারই পিছনে আমি ঘুরিয়াছি ছলনার স্বর্ণমৃগ নারী, আজ ধরিয়াছি—কি, কথা বলছো না যে?'

এস্টার তখনো নিশ্চুপ।

'এসো এসো, আমাকে আর ভয় করতে হবে না। আগে জামা কাপড় পরে নাও, তারপর জমিয়ে গল্প করা যাবে, কি বলো?'

৯

তিনদিন পরে একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেল। বারান্দায় সবাই বলাবলি করলো, এতে নিশ্চয়ই রেঝসেকের হাত আছে। ভ*াড়ার থেকে চিলে ছাদ পর্যন্ত ঠাসা এ বাড়ির সবাই বসবাস করছে বছরের পর বছর। সত্যি বলতে কি—তিন চার পুরুষ ওরা পরিবারের পরস্পরকে চেনে, ভালো করে জানে কার সাথে কখন হেসে কথা বলতে হয়, আবার কখন ফেলতে হয় শুধু দুঃখের গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস।

কিন্তু ভালো করে কেউ কিছুই জানে না। রেঝসেক। সত্যি? স্মরণীয় কাল থেকে সে বাস করে আসছে তেতলার সেই চিলে ছাদে, অথচ অন্য ভাড়াটে-দের কেউই বলতে পারে না ওকে ভালো করে চিনি। বারান্দায় তর্কের ঝড় ওঠার আগে থেকেই জার্মানদের সঙ্গে রেঝসেকের যে একটা সম্পর্ক ছিলো, একথা অবিশ্বাসের কোন অবকাশ না থাকলেও কেউ কোন দিন ভালো করে জানবার প্রয়োজনও অনুভব করেনি।

সবাই ওকে অপ্রতিবেশী মনোভাব নিয়ে দেখে, যে সবসময় ঘরের দরজা বন্ধ করে কাটায় এবং স্ত্রীকে কলতলায় অন্য কোন বউদের সঙ্গে কোমরে হাত রেখে গল্প করতে দেয় না। তার ব্যবহার বেশ উদ্ধত, যেন কত সম্ভ্রান্ত। শহর-তলির উপকণ্ঠে কোথায় যেন তার ছোট্ট একটা কাঠের ব্যবসা ছিলো, যুদ্ধের আগেই ডকে উঠে গেছে। তারপর থেকেই তার ওপর সবায়ের একটা করুণা ছিলো। রোজ সন্ধ্যায় ভারি ব্যাগটা নিয়ে সে যখন টলতে টলতে সি*ড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যেতো, মনে হতো যেন কত ক্লান্ত বিষণ্ণ। একদিন তার বউটা মারা গেল, যেন সন্ধ্যাদীপের ছোট্ট শিখাটা হঠাৎ নিভে গেল। অথচ একই ধারায় বয়ে চললো পুরনো বাড়ির জীবন স্পন্দন। তার দুবছর পরে তাদের লিকপিকে ছেলেটা কোথায় যেন পালিয়ে গেল। কেউ বলে ও এখন জার্মানীর কোন এক টেকনিক্যাল কলেজে পড়ছে। আগে মাঝে মাঝে ওকে দেখা যেতো বারান্দায় মার্চ করতে। সার্টের কলারটা ওল্টানো, পালিশ করা চকচকে বুট, মাথার টুপিটা চোখের কোল পর্যন্ত টানা। ওরা ওকে শেষবার দেখেছিলো কয়েক মাস আগে, সৈনিকের পোষাকে জার্মান বন্ধুর সঙ্গে। দরজার সামনেই ওরা বাবাকে বিদায় জানিয়েছিলো। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় রেঝসেক ঘরের দরজা বন্ধ করে প্রচণ্ড মদ খেয়েছিলো, আর সারারাত চিৎকার করে মাতালের

স্খলিত স্বরে গান গেয়েছিলো। অথচ কেউ একবার ফিরেও তাকায়নি। শুধু অনুভব করেছে রেঝসেক মাতাল হয়েছে, তলিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতল গভীরে। কিন্তু এখন সবাই ওকে ভয় পায়। কাছে আসতে দেখলেই থেমে যায় ফিসফাস—এই, রেঝসেক। যদিও মানুষবিদ্বেষী এই নিঃসঙ্গ মানুষটা অল্প কয়েকদিন ধরে পুরনো আন্তরিকতা আবার নতুন করে ঝালিয়ে নিতে শুরু করেছে। কাউকে কাছে দেখলেই মাথা থেকে টুপিটা খুলে গায়ে পড়ে আলাপ করে। শয়তান কোথাকার, তোমার চালাকি আর আমরা বুঝি না! বারান্দায় নরক গুলজার করা সবায়ের ধারণা—এই ফাঁকে ও প্রচুর পয়সা করে নিয়েছে। নইলে দেখছো না, বাড়িতে কেমন প্রিন্সের মতো গাউন পরে মুখে পাইপ লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায়। নতুন সুট, কোটের বোতামে রক্তগোলাপ। কি ব্যাপার, প্রেম করতে চললো নাকি!

সেদিন রেঝসেক ঘর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে এক টুকরো কাগজ। পর্দার আড়াল থেকে কয়েক জোড়া চোখ তাকে অনুসরণ করছে। চিবুক বেয়ে ঝরে পড়ছে তার চোখের জল, কেঁপে উঠছে সারা দেহ। পাশের দরজায় দাঁড়ানো মহিলাটিকে কাগজটা নিঃশব্দে তুলে দিলো। গুছিয়ে স্পষ্ট করে সে কিছুই বলতে পারেনি। প্রতিবেশী মহিলা সহানুভূতি জানিয়ে চিঠিটা ফিরিয়ে দিয়েছিলো। পরে ওই-ই আবার সবাইকে বলেছিলো—পূর্বসীমান্তে খারকভের যুদ্ধে তার ছেলে বীরের মতো মৃত্যুবরণ করেছে। ফুয়েরার এবং মহান জার্মান সাম্রাজ্যের জন্যে ও জীবন উৎসর্গ করেছে। বেশ বাবা, বেশ!

তারপর রেঝসেক একা টলতে টলতে ফিরে এসেছিলো চিলে ছাদে, কড়া নেড়েছিলো স্টুডিওর দরজায়। কে জানে কেন যে ও ওখানে গিয়েছিলো। চিলে ছাদের সেই শিল্পীকে ওরা সবাই চেনে। আশ্চর্য সুন্দর সেই মানুষটি। এলোমেলো রুক্ষ চুল, কেমন যেন উদাস তন্ময় দুটি চোখ। হয়তো রেঝসেক চেয়েছিলো তারই মতো নিঃসঙ্গ কোন মানুষের কাছে হৃদয় উজাড় করে দুঃসহ এই যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেতে।

একটু পরেই ওরা আবার তাকে দেখলো মাতালের মতো টলতে টলতে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসতে, এবং স্টুডিওর দিকে ফিরে চিৎকার করতে, আচ্ছা, আমিও তোমাকে দেখে নেবো, কমিউনিস্ট শয়তান কোথাকার!

ঠিক এর পরের দিনই সেই বিশ্রী ঘটনাটা ঘটে গেল।

পল আর এস্টার—ওরা দুজনে যেন পাহাড়ের চূড়া বেয়ে ওপরে উঠে

চলেছে। পাহাড়ের চূড়া বেয়ে মেঘের স্তর ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে। কে যেন আদেশ করলো পাহাড়ের সবচেয়ে উত্তুঙ্গ চূড়ায় উঠে যাও। সে কিন্তু তার মুখ দেখতে পেলো না, স্মরণ করতে পারলো না তাকে কেমন দেখতে। অথচ এস্টার আর হাঁটতে পারছে না। ক্লান্তিতে আনত হয়ে এসেছে মাথা, ভেঙে পড়েছে চূর্ণ কুন্তল। ও পলকে দেখালো ওর রক্তাক্ত করতল, তখনো রক্ত ঝরছে। অন্তহীন কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে সারা দেহ। সে ওকে সান্ত্বনা দিলো, বুঝিয়ে দিলো এগিয়ে আমাদের যেতেই হবে। কিন্তু সে নিজেই শুনতে পেলো না তার কণ্ঠস্বর। তার বুঝি কোন কণ্ঠস্বর নেই। সে ওকে এলোমেলো রুক্ষ পাহাড়ি চূড়ার ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে চললো। নিচে কুয়াশা ঢাকা অতল জলরাশির দিকে তাকাতে সে ভয় পেলো, যদি পড়ে যায়। তাই আকাশের দিকে সে চোখ রাখলো। হয়তো আর কয়েক পা…হঠাৎ পাহাড়ের পেছন থেকে দুরন্ত একটা ঝড় এসে ওদের কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। বুক ফাটা যন্ত্রণায় সে চিৎকার করে উঠলো। কিন্তু বাতাসের গর্জন আর আর্তনাদ ছাড়া কিছুই শোনা গেল না। একটু, আর একটু কষ্ট করেও চলো আমরা ওপরে উঠে যাই, লক্ষ্মীটি। পল ওকে টেনে তুলতে চাইলো। পারলো না।

সহসা শুনলো কার যেন তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। একটা পাখি! শকুন কিংবা বিশাল একটা ঈগল—চূড়ার চারদিকে উড়ছে। তার ছড়ানো ডানার সবটুকু ছায়া এস্টারের মুখে। সে দেখতে পেলো পাখির চোখদুটো, ঠিক যেন মানুষের মতো। এর আগে চোখদুটো সে যেন কোথায় দেখেছে। এখন পাহাড়ি চূড়ার শেষ প্রান্তে সে দাঁড়িয়ে—এক হাতে আঁকড়ে ধরতে শক্ত পাথর, অন্য হাতে ওর হাতটা। ও ঝুলছে তার হাতের মুঠোয়, ঘুরছে, একই কেন্দ্রে, দপ্‌দপ করে জ্বলে উঠছে কোটের হলুদ তারাটা। আর ওদের অনেক অনেক নিচে কুয়াশা-চ্ছন্ন নীলিম সমুদ্রের অতল জলরাশি। পাখিটা আবার উড়ে এলো। সে দেখল শিকারী থাবার পরিবর্তে মানুষের মতো লোমশ দুটো হাত। হাতদুটো এস্টা-রের পা ধরে প্রচণ্ড শক্তিতে নিচের দিকে টানছে। ছিনিয়ে নিতে চাইছে ওকে তার হাত থেকে। ওরা দুজন পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো। সব ভাষা যেন লুণ্ঠিত। নিঃশব্দ ঠোঁট দুটো শুধু নড়ছে। পল ওকে ধরে রাখতে পারলো না। ওর চোখ দুটো ছাড়া এখন সে আর কিছু দেখতে পেলো না। চকিতে মনে হলো ওর বুঝি চোখ নেই—শুধু চাপচাপ অন্ধকারের দুটি গহ্বর। সে ওর হাত ছেড়ে দিলো। আর এস্টার পুতুলের মতো ছোট থেকে ছোট হতে হতে

কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে গেল। শুধু ওর অন্তিম আর্তনাদ গির্জার ঘন্টাধ্বনির মতো প্রতিধ্বনিত হলো তার চারদিকে। চকিতে মনে হলো সে যেন পালকের মতো হালকা হয়ে গেছে, এখুনি বুঝি আকাশে উড়ে যেতে পারে। সে উড়ে যেতে চাইলো, কিন্তু কে যেন তার হাতটা ধরে রেখেছে। সে চিৎকার করতে চাইলো, কে যেন তার মুখটা বন্ধ করে দিয়েছে। নিজেকে সে ছাড়িয়ে নিতে চাইলো, কিন্তু পারলো না। অসহ্য যন্ত্রণায় সে আর্তনাদ করে উঠলো—না, না, না, কিন্তু পাখিটার তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না।

হঠাৎ পলের ঘুম ভেঙে গেল।

জানলা দিয়ে ভোরের একমুঠো আলো এসে পড়েছে ভেতরে। খাঁচায় ক্যানারিটা ডাকছে। রান্না ঘর থেকে ভেসে আসছে কফির গন্ধ। চোখদুটো তার ঘুরে চললো ঘরের চারদিকে। রাত্রির দুঃস্বপ্ন এখনো তার মনে। যেন দিনের আলোয় সে হেঁটে চলেছে অস্পষ্ট ছায়ার মধ্যে দিয়ে, শিরায় শিরায় রক্তের প্রতিটি স্রোতে অশুভ ইঙ্গিত—এ বুঝি পূর্বাভাস। বোকা কোথাকার, এ তো স্বপ্ন! সেদিন তার মৌখিক পরীক্ষা, স্কুল ছেড়ে আসার শেষ দিন।

কি ব্যাপার পল? পরীক্ষকের সামনে দাঁড়িয়ে সে যন্ত্র চালিতের মতো বলে চলেছে ফুয়েরারের জীবন ইতিহাস। সারা বুক জুড়ে সে যে কি যন্ত্রণা, বিষন্ন একটা হাহাকার যেন তাকে সমানে চাবকে চলেছে। ছায়াঘেরা বারান্দটা সে পেরিয়ে এলো। বন্ধুদের দৃষ্টি এড়িয়ে ক্লান্ত দেহটাকে টানতে টানতে নিয়ে এলো বাগানের সামনে। কি ব্যাপার পল, তুমি কি অসুস্থ? পরীক্ষকের মুখে উদ্বিগ্নের ছায়া। কিন্তু তুমি তো আজ পরীক্ষা খুব খারাপ দাও নি? তারপরেই বন্ধুরা: তোর কি খবর রে? আজ আমি জর্মান ভাষায় নির্ঘাত ফেল করবো। গেটের বাইরে টিখ অপেক্ষা করছিলো, খড়ির মতো সাদা তার মুখ। 'সিয়েন'এর ধাতুরূপটা কি করে করলি রে? অ্যাডলফ্ হিটলার ভুয়ার্দ ইন ব্রাউনাউ গেবোর্ণ… চুলোয় যাকগে। চল, মাঠে গিয়ে বল পিটিয়ে আসি।

সবাই তাকে একা ফেলে চলে গেল।

গ্রীষ্মের উত্তপ্ত পথে পল ক্লান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে চললো। পাশে অন্ধ ছায়ার মতো রাত্রির সেই দুঃস্বপ্ন। রাস্তার মোড়ে নতুন একটা পোস্টার। থেমে গেল তার পথ চলা। বুকের মধ্যে সেই একই হিমেল শীতলতা। বিস্ফারিত চোখের তারায় অজস্র নাম, যাদের মুখ সে কখনো দেখেনি। তার চারপাশে অসংখ্য মানুষের ভিড়।

রুদ্ধ নিশ্বাসে ওরা পড়ে চলেছে— পুরুষদের গুলি করা হবে, নারীদের নিয়ে যাওয়া হবে বন্দী-শিবিরে, শিশুদের লালন করা হবে···বস্তি-বাড়িগুলোকে অবিলম্বেই ধূলিসাৎ করে ফেলা হবে···

তার নিচেই অন্য পোস্টারে যাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে তাদের নাম।

নিজেকে কোন রকমে ভিড়ের মধ্যে থেকে টেনে নিয়ে এলো বাইরে। মাথা নিচু করলো, যাতে তার মুখ তার চোখ কেউ না দেখতে পায়। ত্রস্ত হয়ে এলো তার পথ চলা। রাত্রির সেই স্বপ্নটাও চলেছে তার পায়ে পায়ে জড়িয়ে, যেন দুচোখ অন্ধ কোন পাখি। না না, পাখিটার তো চোখ ছিলো, মানুষের মতো আশ্চর্য উজ্জ্বল দুটো চোখ!

এখন সে ছুটছে। এখুনি এস্টারের কাছে পৌঁছতে হবে। রুদ্ধ তার নিশ্বাস। রাস্তার এক কোণে সে সরে দাঁড়ালো। ভয় হলো রাস্তার সবাই বুঝি তাকে দেখছে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে নিজেকে কিছুটা শান্ত করার চেষ্টা করলো, বার বার তাকিয়ে দেখলো নক্সাকরা রাস্তার বাঁধানো পাথর। অজানা ভয়, একটা যন্ত্রণা বুকের গভীর থেকে তাকে নাড়িয়ে গেল। সারা দেহ হিম। হাঁটুর নিচেটা শুকনো পাতার মতো থর থর করে কাঁপছে। রাত্রির সেই দুঃস্বপ্ন!

পরিত্যক্ত একটা টেলিফোন বুথের গায়ে সে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। পরিচিত একটা মারসিডেস। চামড়ার জ্যাকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে গাড়ির চালক ফুটপাথের সামনে অপেক্ষা করছে। কিছুক্ষণ পরে সিগারেট ধরিয়ে ও হাই তুললো। ওর কুতকুতে কালো চোখদুটো দ্রুত ঘুরে চলেছে পুরনো বাড়িটার দেওয়ালে দেওয়ালে, জানলায়। জানলাগুলো নির্জন। জীবন যেন এখন ঘুমিয়ে পড়েছে কোন জাদুর স্পর্শে। তবু পল জানে পর্দার আড়াল থেকে অসংখ্য চোখ শিকারী হায়নার মতো ওত পেতে থাকা কালো ভ্যানটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে। রাস্তার সমস্ত বুক জুড়ে নেমে এসেছে আতঙ্কের কালো ছায়া। পল কিছু দেখতে পেলো না, তবু বাতাসে যেন বিপদের গন্ধ পেলো।

এস্টার! এখুনি যে ওর কাছে যেতে হবে, নইলে ও বুঝি পাগল হয়ে যাবে! কপালের শিরাগুলো দপদপ করে জ্বলছে। বাড়িটার দিকে সে এগিয়ে চললো, স্বপ্নাচ্ছন্ন যেন ঘুমের মধ্যে দিয়ে সে হেঁটে চলেছে। পৃথিবীর আর সবকিছু মুছে গেছে, শুধু প্রচণ্ড শব্দে ভেঙে পড়ছে কপালের রক্তস্রোত। সে শুনতে পেলো কার যেন অসহ্য চিৎকার। কই, কেউ তো নেই। তাহলে কি কল্পনা! সবকিছুই নিস্তব্ধ, শুধু ট্রামের ঠুংঠাং শব্দ, মোটরের হর্ণ। বাতাসের মতো দ্রুত পায়ে সে

এগিয়ে চললো। ঝড় বইছে তার বুকের মধ্যে। কে যেন তার জামার হাতাটা টেনে ধরলো। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো বারান্দার পরিচিত একটি মুখ।

'ওখানে যেও না পল,' পরিচিত সেই মুখ। জামার হাতাটা একটুও আলগা না করে বরং আরো শক্ত করে চেপে রইলো।

'কেন কিছু হয়েছে?'

'ওরা কাকে যেন নিয়ে যেতে এসেছে।'

.

চকিতে অনুভব করলো সে তখনো টেলিফোন বুথের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। রাস্তার বাঁধানো পাথরে জ্বলন্ত সূর্য অকৃপন হাতে ঢালছে তরল অগ্নি স্রোত। আলোর তীক্ষ্ণ তীরগুলো এসে বিঁধছে তার মুখে। ঘামের ছোট্ট একটা স্রোতস্বিনী বয়ে চলেছে কাঁধের নিচে দিয়ে সার্টের মধ্যে। না না, আমি জাগবো, সবকিছুই আবার দেখবো আগের মতো সুন্দর সাজানো—আমার ঘর, আমার বই, ক্যানারি, দেওয়ালে টাঙানো নক্ষত্রের মানচিত্র, এসবই তো স্বপ্ন। এস্টার—হয়তো সেও স্বপ্ন! না না, এ হতে পারে না, এ আমি চাই না। টেলিফোন বুথের আড়াল থেকে পল দেখলো ভ্যানটা তখনো দাঁড়িয়ে।

অন্তহীন সময়ের বুঝি আর শেষ নেই।

ওরা এখনো ফিরে এলো না কেন? ওদের বিশাল শিকারী হাতের থাবায় ছোট্ট চড়ুইয়ের মতো ও যে ভয়েই মরে যাবে।

একটু পরেই ওরা বাইরে বেরিয়ে এলো, বিশাল পাঁচটি দেহ। ওদের মুখ পল দেখতে পেলো না। তবু ভালো। ওদের সঙ্গে অন্য একটি তরুণ, টুপিহীন, সার্টের বোতামগুলো সব খোলা। হাতকড়া না পরিয়েই ওরা তাকে গাড়ির কাছে টেনে নিয়ে এলো। ভেবেছিলো ওদের বজ্রমুঠি, ওদের খোলা রিভলভারের হাত থেকে ও মুক্তি পাবে না। তাছাড়া ওরা সবাই ছিলো খুব সাধারণ পোশাকে। গাড়ির কাছে পৌঁছতেই দরজাটা খুলে গেল, তারপরেই শোনা গেল ইঞ্জিনের গর্জন।

মুহূর্তের জন্যে মানুষটা থমকে দাঁড়ালো, সূর্যের আলো এসে পড়েছে ওর মুখে। রাস্তার দিকে তাকিয়ে ও মাথা তুললো। জানলার ফুলদানিতে রাখা রডেডনডন আর অ্যাজেলিয়ার গুচ্ছ। পর্দার আড়াল থেকে অজস্র চোখের অবাক প্রশ্ন। গভীর নিশ্বাসে ও বুক ভরে নিলো স্বচ্ছ বাতাস, তারপর কাঁধদুটো টানটান করে মেলে দিলো।

আশ্চর্য, এ যে চিলে ছাদের সেই শিল্পী!

ওদের একজন পেছন থেকে লোকটার পাঁজরে আঘাত করলো, টেনে নিয়ে এলো ভ্যানের ছায়ার নিচে। দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ। তারপরেই প্রচণ্ড শব্দে গর্জন করতে করতে রাস্তার সমস্ত নিস্তব্ধতা কাঁপিয়ে গাড়িটা ছুটে বেরিয়ে গেল।

১০

এবং সব কিছুই—রাস্তায় বাড়িতে জানলায়, পথিকের মুখে, জীর্ণ খিলানে, সব কিছুই যেন উঠে এলো সমুদ্রের অতল থেকে, ছড়িয়ে পড়লো রাশিরাশি অবাক বিস্ময়। ধীরে ধীরে রাস্তাটা আবার ফিরে এলো তার পুরনো জীবনে। কোথায় যেন কুকুরের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ, ছুটে চলা ঘোড়ার খুরের শব্দ।

এগিয়ে চললো পল। শিরায় শিরায় তার মুক্তির অমিত আনন্দ। যদিও কি হীন কি কুৎসিত কি স্বার্থপর এই মুক্তির আনন্দ। এখন তাকে আরো গভীর করে ভাবতে হবে। এভাবে ওকে এখানে রাখা উচিত নয়। ওরা হয়তো সারা বাড়ি, প্রতিটা ফ্ল্যাট ক্ষিপ্ত কুকুরের মতো তন্নতন্ন করে খুঁজবে। আজ কিংবা কাল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কপালের ঘাম মুছে হাতের মুঠো ওরা ভরিয়ে তুলবেই ওকে এখান থেকে নির্জন কোথাও নিয়ে যেতেই হবে। কিন্তু কোথায়? শহরে কাকিমার কাছে? সে কি বাবা মাকে বুঝিয়ে রাজী করাবে? ভয়ে মরে গেলেও সে ওদের বাধ্য করাবে, কেননা ও যে বাঁচতে চায়। যতদিন না এই প্রাগঐতিহাসিক নগ্নতা শেষ হচ্ছে, যতদিন না রাইফেলের মুখগুলো শান্ত আর নির্যাতীত জীবনে শান্তি না ফিরে আসছে—ওকে যে বাঁচতে হবেই!

একরাশ ভাবনার বোঝা কাঁধে নিয়ে সে ঘুরে চললো। রাস্তাটা কেমন যেন বদলে গেছে, মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধ, দুপুরের জলন্ত সূর্যে কেবলই পুড়ছে। তৃষ্ণায় গলার ভেতরটা তার শুকিয়ে এলো। প্রথমে দোকানে যেতে হবে। আগে এক-গ্লাস জল, তারপর অন্য কিছু।

দোকানের ভেতরটা থমথমে। ভারি হয়ে উঠেছে বিকেলের স্বচ্ছ বাতাস। ভেতরে কে যেন দাঁড়িয়ে। ধুলোয় ধূসর মেঝে, চারদিকে ছড়ানো টুকরো কাপড়। লোকটার প্রশস্ত কাঁধ ফেরানো পলের দিকে। তবু এক পলকেই সে ওকে চিনতে পারলো। দাঁড়িয়ে রইলো নিশ্চল পাথরের প্রতিমূর্তির মতো। ও এখানে কি করছে?

লোকটা অনর্গল কথা বলে চলেছে। ওরা তার প্রতি উত্তরে কাটাকাটা জবাব দিচ্ছে। দর্জি তার সামনে মেঝেতে বসে পায়জামার মাপ নিচ্ছে। মাঝে মাঝে নোটবুকে টুকে নিচ্ছে আর ছেলের দিকে নিঃশব্দে ভ্রূ কুঁচকে তাকাচ্ছে।

সত্যি ওরা সবাই নিশ্চুপ। শুধু রেঝসেকই অনর্গল বকে চলেছে।

'এবং আমি নিজেও তাই বলি, কি দরকার অন্য কোথাও মিছিমিছি দর্জির খোঁজ করবার, এখানে যখন একটা রয়েছে। তাছাড়া আমার জন্যে নিশ্চয়ই যত্ন নিয়ে করবেন, যাতে অন্তত একটু সুন্দর দেখায়।'

কেউই হাসলো না। শুধু তার কথার ফাঁকে ফাঁকে নেমে এলো মৃত্যুর কঠিন নিস্তব্ধতা। কে যেন দীর্ঘশ্বাস ফেললো। রৌদ্রস্নাত নীল একটা ভ্রমরের অলস গুঞ্জরণ, কাচের সার্সী ভেদ করে বেরিয়ে যাবার সেকি দুঃসহ আকুতি।

টেবিলে ঝুঁকে পড়ে চিপেক আঙুলে কাপড়টা পরীক্ষা করে দেখলো।

'কেমন বুঝছেন?' রেঝসেকের কণ্ঠস্বরে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ। 'পশম মেশানো—মোটামুটি' বেশ সুন্দর, তাই না?'

'নিশ্চয়ই!' সবকিছুকে ছাপিয়ে প্রতিধ্বনিত হলো দর্জি কণ্ঠস্বর। 'আজকে দিনে এমন জিনিস পাওয়াই যায় না।'

'তাই নাকি?' আত্মতৃপ্তিতে বুজে এলো রেঝসেকের কণ্ঠস্বর। 'ব্যাপারটা কি জানেন, কাপড়টা বহুদিনই আমার কাছে পড়েছিলো, তাই ভাবলাম সুটটা তাড়াতাড়ি বানিয়ে নিই। তাছাড়া দামটা যখন সঙ্গে সঙ্গেই দিয়ে দিচ্ছি।'

'আমার মনে হয় কাপড়টা তেমন গরম হবে না', উপেক্ষার ভঙ্গিতে চিপেক বললো।

'আপনার বুঝি তাই মনে হয়?' তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো রেঝসেক চোখ মেলে তাকালো। দর্জি একবার কাশলো। চিপেক বুঝতে পারলো ও কি বোঝাতে চাইছে, কাশির শব্দে সন্দেহজনক কথাটাকে যদি চাপা দেওয়া যায়।

'ওরা যে বললো খুব গরম হবে, সবচেয়ে দামী পশম।'

'ও!'

'দেখুন, আপনি যদি কিছু মনে না করেন...'

'না, না, মনে করার কি আছে—এমনি বললাম।'

'আগেকার কথা ছেড়ে দিন। আজকে দিনে এমন জিনিস তো...'

'আপনি দেখছি স্বোয়েকের মতো কথা বলছেন?'

'তাই বুঝি। আচ্ছা, স্বোয়েক্ সম্পর্কে আপনার ধারনা কি?'

'বোকা!' উত্তেজনায় ফেটে পড়লো রেঝসেকের কণ্ঠস্বর, 'ওটা একটা আস্ত বোকা। আমাদের অনেকে আজকাল স্বোয়েকের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। ওদের ধারনা এটা একটা ছেলেখেলা। আর দেশটা যেন পাশা, যার যখন খুশি দান চলছে। ভেবে দেখুন—ওরা এখন স্বোয়েকের সঙ্গে সেই খেলায় মেতে

উঠেছে, যার শেষ পরিণতি আত্মহত্যা আর ধ্বংসের চরম সীমায় এসে পৌঁছ-নো। আমার তো মনে হয়, চেকোশ্লোভেকিয়ার পক্ষে এটা দুর্ভাগ্যজনক।'

'নিশ্চয়ই,' চিপেকের কণ্ঠস্বরে সেই একই প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ। 'সত্যিই দুর্ভাগ্য-জনক!'

'আচ্ছা, এখানে একটা বোতাম দেবো না দুটো?' ওদের কথার মাঝেই দর্জি বাধা দিলো। কপাল থেকে ঘামগুলো মুছে নিলো। পলের সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করে উঠে এলো একটা হিমেল শিহরণ।

'একটা...'ঝড়ের মতো থমথমে রেঝসেকের কণ্ঠস্বর। 'উঃ এই যুদ্ধ যে কি বিভৎস, একমাত্র ঈশ্বরই জানেন!'

'কেন?' চিপেকের কণ্ঠস্বরে স্তব্ধ বিস্ময়। 'এ তো খুব সহজ। কাগজ খুলুন, দেখবেন...'

'তা অবশ্য ঠিক। তবু প্রত্যেক মানুষেরই সাধারণ একটা জ্ঞান থাকে। সত্যি বলতে কি—আমাদের দেশের লোক বুঝতেই পারছে না তারা কতটা ভাগ্যবান, কেননা এখনো পঙ্কিল গর্তে তাদের শুতে হয়নি...এত নির্যাতন, তবু তারা বুঝতে শিখছে না ভবিষ্যতে কত সুখ শান্তিতে বাস করতে পারবে...'

'আমার তো মনে হয় রাইখের জন্যে সংগ্রামকে ওরা যথেষ্ট কৃতজ্ঞতার চোখে দেখছে না।'

রেঝসেক মুহূর্তের জন্যে চিপেকের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলো। তার-পর কাঁধদুটো ঝাঁকিয়ে তুললো—'নিশ্চয়ই! এ তো জাতীয়তাবোধ। আমি জানি ওরা কি চায়। জাতীয়তা বোধ ভালো, কিন্তু তার আগে সোজাসুজি মুখের দিকে তাকিয়ে পরিস্থিতিটা দেখে নেওয়া উচিত। বুঝলেন কি না, সবাইকে আগে বাস্তববাদী হতে হবে। পাথরের দেওয়ালে মিছিমিছি মাথা কুটে তো আর কোন লাভ হবে না।'

'কথাটা খুবই সত্যি,' গভীর আগ্রহে চিপেক স্বীকার করলো।

'তাছাড়া, আজকে দিনে এমন কোন রাষ্ট্র থাকতে পারে না যেখানে সমানে অরাজকতা চলে আসবে। একটা লোক তার বালিশের নিচে পিস্তল লুকিয়ে রেখেছে, ভাবুন একবার—পুরনো একটা পিস্তল, তিরিশ বছরেরও পুরনো। রাবিশ। একটা শব্দও হয় না, তাও কিনা ব্যবহার করতে চাইছে ট্যাঙ্ক আর বিমানের বিরুদ্ধে। পাগল, পাগল ছাড়া আর কি! এমনও লোক আছে জানেন যারা উদ্বাস্তু, পুলিসের খাতায় এখনো পর্যন্ত নামই লেখাইনি।'

মুহূর্তের জন্যে সে থামলো, নেমে এলো নিটোল নিস্তব্ধতা। 'আর এই ইহুদী কুত্তার বাচ্চাগুলো, আপনি ভাবতেই পারবেন না—মেরুদণ্ডহীন এই শয়তান-গুলোকে লোকে যে কি করে সহ্য করে...'

কথা বলার সাথে সাথে চোখদুটো ওর ঘুরছিলো দোকানের চারদিকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ও আবিষ্কার করলো সেই ছোট্ট দরজাটা। চকিতে দৃষ্টি সরিয়ে নিলো ঘরের ভেতরে।

'অনেকটা চিলে ছাদের সেই শিল্পীর মতো,' ক্লান্তিহীন চিপেক পূর্বকথার রেশ ধরে এগিয়ে চললো।

'কার মতো ?'

'চিলে ছাদের সেই ভদ্রলোক, যাকে আজ একটু আগে ধরে নিয়ে গেল।'

'ও, সেই বলশেভিক।'

'আপনি কেমন করে জানলেন ?'

'সবাই জানে। তাছাড়া এ রকম একটা পুরনো বাড়িতে...'

বিরক্ত হয়ে দর্জি ওদের বাধা দিলো—'কখন, মানে কবে আপনার সুটটা চাই ?'

'যত তাড়াতাড়ি পারেন। ধরুন, এই এক সপ্তাহের মধ্যে। তাহলে ওই কথাই রইলো।' বন্য পশুর মতো টলতে টলতে ও এগিয়ে এলো। ধূসর রুমালে মুখ মুছলো। ঠোঁটের প্রান্তে ক্রূর একটা হাসি, 'অনেকক্ষণ বেশ গল্প করা গেল। আচ্ছা, এবার তাহলে চলি ?'

কল্পনাতীত ভাবে ও ঘুরে দাঁড়ালো এবং বিশ্রী একটা ঘটনা ঘটে গেল। দরজা ভুল করে ও সোজা সেই ছোট ঘরটার দিকে এগিয়ে চললো। কিছু বুঝে ওঠার আগেই, দরজার হাতলটা ঘোরাবার চেষ্টা করলো। সবাই স্তম্ভিত। শুধু পল ছাড়া। বিবর্ণ মুখে সে উঠে দাঁড়ালো। কেউ তাকে দেখতে পেলো না। পাশের টেবিলে দর্জির দীর্ঘ কাঁচিটা সে অনুভব করলো। দৃঢ় মুষ্টিতে চেপে ধরলো, সাদা হয়ে এলো হাতের আঙুল। এবার! অর্ধনমিত চোখে সে লক্ষ্য করলো দরজার হাতলে রাখা বিশাল হাতের থাবাটা। শয়তানের ধাড়ি!

ব্রেঝসেক হাতলটা আবার ঘোরাবার চেষ্টা করলো।

আঘাত হানবে! লাফিয়ে পড়বে পেছন থেকে। সমস্ত শক্তি দিয়ে তীক্ষ্ণ মুখটা বসিয়ে দেবে পাঁজরের মধ্যে, বিচ্ছিন্ন করে দেবে লোমশ হাতটা। সারা দেহ তার টান টান, রক্তের প্রতিটি শিরায় আক্রমণের তীব্র উন্মত্ততা।

কিন্তু কিছুই হলো না। শুধু শোনা গেল ওর গভীর দীর্ঘশ্বাস।

হাতলটা ঘুরলো না। রেবসেক দোকানের দিকে ফিরে দাঁড়ালো। চোখের তারায় অনুসন্ধিৎসু একটা প্রশ্ন। হতাশায় কাঁধ দুটো ও ঝাঁকিয়ে তুললো।

'এইটে বাইরের দরজা, দয়া করে যদি...' সসম্মানে দর্জি এক পাশে সরে দাঁড়ালো।

'ঈশ, কি আশ্চর্য! আমি গুলিয়ে ফেলেছিলাম।'

ও বেরিয়ে গেল। পেছনে রেখে গেল এক ঝলক উষ্ণ নিস্তব্ধতা।

নিতল নিস্তব্ধতা।

দর্জি তার নোটবইটার দিকে চোখ রাখলো, যেন একটু আগে লিখে রাখা মাপটা বিবেচনা করে দেখছে। বিরক্তিতে কুঁচকে উঠলো কপাল, 'কলারটা একটু টাইট হলো না? হুঁ, যা ভেবেছি তাই...'

'এই বাজে জিনিসটা তুমি সত্যিই করবে নাকি?' চিপেক সোজাসুজি আক্রমণ করলো। দর্জি আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে হাতদুটো ওপরে তুলে চিপেককে থামিয়ে দিলো, 'তাতে আমার কি? আর তুমিই বা সব সময় আমার পেছনে লাগো কেন বলো তো? আমার ইচ্ছে হয় করবো, নাহয় করবো না। আমরা যা চাই তা তো জানো। তাছাড়া এটাতো আর নিলাম নয় যে...'

'তা তো বটেই। একদিন মানুষের চামড়া এনে বলবে, একটা সুট বানিয়ে দিন তো। আর তুমিও তাকে দু বোতামের সুন্দর একটা জ্যাকেট বানিয়ে দেবে, তাই না?'

'বোকার মতো বোলো না', ক্লান্ত দর্জির কণ্ঠস্বর। 'তোমার আর কি? তাছাড়া এরকম রাগ করার কোন মানেই হয় না।'

'বেশ, ইচ্ছে হয় কর, না হয় করো না।'

'না করে উপায় কি?'

'সেটা তোমারই জানা উচিত, তুমি যখন এ দোকানের মালিক।'

স্বাভাবিক তর্ক জমে ওঠার আগেই দর্জির কাঁচিটা ঝনঝন শব্দে মেঝেতে পড়ে গেল। দুজনেই ঝুঁকে পড়লো টেবিলের নিচে।

অস্পষ্ট আলো ছায়ায় এস্টারের পাশে শুয়ে অমল শান্তিতে তার বুজে এলো চোখের পাতা, মনেহলো এ যেন স্বপ্ন। তবু বাস্তব এই উষ্ণ স্পন্দন। ইচ্ছে করলে এখনি সে স্পর্শ করতে পারে, গ্রহণ করতে পারে ওর চুলের স্নিগ্ধ

গন্ধ, ওর দু ঠোঁটের নিবিড উষ্ণতা। ওর দুই স্তনের মাঝে হারিয়ে ফেলতে পারে নিজের সবটুকু রক্তস্রোত। রাত্রির সেই দুঃস্বপ্নকে দুপায়ে মাড়িয়ে নিজের সত্তাকে খুঁজে পাবার জন্যে সে পালিয়ে এসেছে এখানে। তবু এখনো কিছু রয়ে গেছে। সারা দিনের সমস্ত ঘটনা যেন তারই অস্পষ্ট অজানা প্রতীক। সে তাকে দেখতে পাচ্ছে না, অথচ স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে বন্দী খাঁচায় রক্তাক্ত পাখির অসহ্য আর্তনাদ।

'এই, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো ?'

'কই, নাতো।'

মাথা ঘুরিয়ে সে আকাশের দিকে তাকালো। সৌরমণ্ডলের সুনিয়ন্ত্রিত অনুশাসনে সুসজ্জিত নক্ষত্রপুঞ্জ। সব কটির নামই তার জানা।

'পল, ওরা তাঁকে কি করবে ?' অন্ধকার থেকে ভেসে এলো এস্টারের ভীরু কণ্ঠস্বর।

'তুমি দেখতে পেয়েছো ?' কনুইয়ের ওপর ভর রেখে সে উঠে বসলো।

'হ্যাঁ। ওরা তাঁকে জানলার সামনে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো। জলন্ত সিগারেটটা ঠোঁট থেকে পড়ে গেল। রোগা মতন দেখতে, বিবর্ণ·· বোধহয় অসুস্থ ছিলেন। এক হাতে দস্তানা। আমার মনে হলো কি যেন একটা গভীর ক্ষত লুকিয়ে রয়েছে বুকের মধ্যে।'

'ওরা তোমাকে দেখতে পায়নি তো ?'

'না। আমি যে কম্বলের মধ্যে লুকিয়ে ছিলাম।'

'তুমি ঠিক করেছিলে,' ঠোঁটের প্রান্তে তার ম্লান একটুকরো হাসি।

'আচ্ছা, উনি কে ? চিলে ছাদের সেই শিল্পী ? যিনি খুব করুণ সুরে গীটার বাজাতেন ?'

'হ্যাঁ। আগে অবশ্য অন্য সুর বাজাতেন। আমি ঠিক জানি না, সবাই বলে ওর বউ নাকি তাঁকে ছেড়ে চলে যাবার পর থেকেই…'

'ওরা তাঁকে ধরে নিয়ে গেল কেন ?'

'বাড়ির সবাই বলছিলো উনি নাকি কমিউনিস্ট।'

'ওরা ওদের শাস্তি দেয় কেন ?'

'আমার মনেহয় রাশিয়ায় অনেক কমিউনিস্ট, ওঁরা বোধহয় তাদের জন্যে সংগ্রাম করছেন। অবশ্য আমি ঠিক জানি না, কেননা এ সম্পর্কে আগে আমি কিছুই ভাবিনি।'

'রাশিয়া একদিন ওদের চরম শাস্তি দেবে, তোমার কি তাই মনেহয় না।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কিন্তু কবে তা জানি না।'

'ওরা আমাদের ওপর এত নির্যাতন করে কেন?'

'কেননা ওরা পশু। জাতি সম্পর্কে ওদের একটা আদিম রীতি আছে, তাই বন্য পশুর মতো হন্যে হয়ে ওরা তোমাদের খুঁজে বেড়ায়।'

'কিন্তু এটা তো অরণ্য আদিম যুগ নয়, বিংশ শতাব্দী?'

'তা ঠিক...' ঠোঁটের প্রান্তে তার তিক্ত হাসির রেখা, 'কিন্তু আমরা বাস করছি যে বিংশ শতাব্দীর এক আশ্চর্য সময়ে। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত কখনো এমন করে ভাবিনি। হঠাৎই একদিন মনে হলো ওদের অনুশাসনের বিশাল খাঁচায় আমরা বন্দী। পালাবার কোন পথ নেই...'

মুহূর্তের জন্যে পল থামলো, মাথা রাখলো সোফার ওপরে। অন্ধকারে অনুভব করলো ওর দেহ। দুহাতে ওকে টেনে নিলো বুকের কাছে। আঙুলে স্পর্শ করলো চূর্ণ কুন্তলের অবাধ্য ঘূর্ণি। ওর অজস্র চুলের মধ্যে মুখ রেখে সে নিশ্বাস নিলো। ভাবলো আর কিছু ভাববে না।

'পল।'

'উঁ!'

'বাইরে এখন কি হচ্ছে বলো তো?'

মিনতিভরা ওর কোমল কণ্ঠস্বর তাকে আহত করলো। সে উঠে বসলো। অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে ছোট্ট বাতির সুইচটা খুঁজলো। আলোটা ঘুরিয়ে দিলো। ইচ্ছে করেই ওর দিকে ফিরে, ঠোঁটের কোলে ফুটিয়ে তুললো ছোট্ট একটা হাসি, 'কই, তেমন কিছু তো হয়নি!' ওর দৃষ্টি এড়িয়ে পল অনেকটা সহজ হতে চাইলো। কিন্তু চোখে চোখ পড়তেই বুঝতে পারলো ও অনেক কিছু জানে। চোখের তারায় তারই স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।

'তুমি কেমন করে জানলে?' কণ্ঠস্বরে তার অজানা একটা আতঙ্ক।

'বেশী কিছুই জানি না। তবু জানি তুমি আমার কাছে গোপন করছো।'

দুহাতে গলা জড়িয়ে পল ওকে মৃদু নাড়া দিলো। জীর্ণ রেডিওটার দিকে নির্দেশ করে বললো, 'নিশ্চয়ই তুমি ওটা শুনেছো? আমার উচিত ছিলো জানালা গলিয়ে ওটাকে বাইরে ফেলে দেওয়া। অবশ্য তোমাকে আমি তা করতে বলবো না, কিন্তু তুমি এত উৎসুক কেন বলতো? এ বাড়িতে কত রকমের লোক বাস করে। সবাই যে খুব খারাপ তা নয়, তবে সবাই এখন সন্ত্রস্ত।

আমাদের ঠিক ওপরে এক ভদ্রলোক থাকেন, যিনি জার্মানীর স্বপক্ষে। আমি হলে ওঁকে এখান থেকে দূর করে দিতাম। তবু তোমার এতটুকু বুদ্ধি থাকা উচিত। এখানে তো তুমি সবচেয়ে নিরাপদ। বাইরে কি হচ্ছে না হচ্ছে তার জন্যে তুমি কিছুই করতে পারো না। তাছাড়া এসব তুমি এখন বুঝবেও না।'

'বেশ, তা না পারলেও, তোমাকে তো পারবো। তুমি ওদের চেয়ে অনেক অনেক বেশী জানো।'

'এ পৃথিবীর আমি কতটুকু জানি ? বিশ্বাস করো, কিছুই জানি না।'

দুহাতের নিবিড়তায় তাকে আঁকড়ে এস্টার কান্নায় ভেঙে পড়লো, যেন নিরুদ্ধ যন্ত্রণায় ফুলে ওঠা কান্নার কয়েকটি ঢেউ আছড়ে পড়লো উর্মিল সমুদ্র-বেলায়। ওর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে পল সোফায় উঠে বসলো। শুনলো ওর গভীর দীর্ঘশ্বাস।

'আমি আর চুপ করে থাকতে পারছি না পল, এ অসম্ভব। আমি জানি, শুনতে পাচ্ছো··· আমি সব জানি। আমাকে এখানে খুঁজে পেলে ওরা তোমাকে গুলি করে মারবে, তোমার বাবা মা, সবাইকে। আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে, এত ভয় করছে···আমার জন্যে তোমাকে···না না, তা হতে পারে না, কক্ষোনো না···'

'এই শোন ! চুপ করো লক্ষীটি···'

'আজই আমি ওদের দেখলাম। কিছুতেই পালাতে পারলাম না। নিজের চেয়েও আমি তোমাকে ভালবাসি পল, বিশ্বাস করো, পাগলের মতো ভাল-বাসি। তবু এখানে আর থাকতে চাই না। মানুষের মধ্যে আমি আর থাকতে পারি না। তাছাড়া তোমাকে···তোমাকে বাঁচতে হবে, পল। শুনতে পাচ্ছো।'

থামিয়ে দেবার জন্যে পল ওর মুখে হাত চাপা দিলো। ছাড়িয়ে নেবার জন্যে এস্টার আপ্রাণ সংগ্রাম করলো। কিন্তু শান্ত না হওয়া পর্যন্ত পল ওকে মুক্তি দিলো না। বালিশে ও মুখ ঢাকলো। কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে ওর শুভ্র কাঁধ দুটো।

'তুমি কি করতে চাও ?'

'আমি চলে যেতে চাই। আজই, এখুনি···'

'না', আর্তনাদের মতো তীক্ষ্ণ প্রতিধ্বনিত হলো পলের কণ্ঠস্বর, 'আমি তোমাকে কিছুতেই যেতে দেবো না '

'যেতে আমাকে হবেই পল, কেন বুঝতে পারছো না ?'

'বুঝতে আমি চাই না।'

'কিন্তু আমাকে যদি এখানে খুঁজে পায়, ওরা তোমাকে গুলি করে মারবে।'

'সে যাই হোক। তোমাকে ছাড়া বাঁচার কথা আমি ভাবতেই পারি না।'

'ছিঃ পল!' ও তাকে শান্ত করতে চাইলো।

'বিশ্বাস করো, এস্টার, আমি আর কিছু চাই না। তুমি যদি চলে যাও …এ ঠিক মৃত্যুর মতো, অভিশপ্ত। তুমি যদি নাই থাকো—আমি আর কিছু শুনতে চাই না, জানতে চাই না, ভাবতে চাই না। তাহলে এ পৃথিবীর মূল্য কতটুকু? কেন আমরা জন্মালাম না অন্য কোথাও, অন্যকোন দেশে, কিংবা প্রাগঐতিহাসিক কোন যুগে? অন্তত মাথার ওপর থাকতো খোলা আকাশ, সাধারণ একটুকরো নীলিম আকাশ। তোমার মনে পড়ে…কয়েকদিন আগেও আমরা একসঙ্গে নিশ্বাস নিয়েছি? তুমি আমি, আমরা দুজনে। তখন এত ভালো লাগতো। কিন্তু আজ শুধু আমার একার জন্যে নিশ্বাস নেওয়া, একার জন্যে নিশ্বাস ফেলা—কি কুৎসিত, জঘন্য! ভাবতেও আমার খারাপ লাগছে।'

'এ তুমি কি বলছো, পল! আমি, আমি যে বাঁচতে চাই…'

'আমিও চাই, হাজার বার চাই, কিন্তু তোমাকে ছাড়া নয়।' কণ্ঠস্বরে এমন অবাধ্য উন্মত্ততা, এমন আহত ক্রোধ—এর আগে ও কখনো দেখিনি, কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি। 'সবচেয়ে খারাপ হলো অপেক্ষা করার আর এক মুহূর্তও সময় নেই। আর অপেক্ষা করেই বা কি হবে? আমাদের প্রজ্বল শতাব্দীর যা কিছু সুন্দর, যা কিছু অনন্ত—সবই মিশে যাচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছে শয়তানের বিশাল থাবায়। হিংস্র পশুর মতো শুধু শিকার খোঁজা। যান্ত্রিক সভ্যতা, প্রগতি আর সেই আদিম অরণ্য-উল্লাস! কেন আমরা তাকে মেনে নেবো? এতো বন্য পশুর অন্ধ গুহা—যদিও ভেতরে প্রচুর উত্তাপ, তবু তোমাকে হাতের শিকার হবার পক্ষে যথেষ্ট। মাঝে মাঝে মনে হয় সভ্যতার শেষ দিন পর্যন্ত বুঝি থাকবে এই অন্ধকার, অনড় অন্ধকার!'

'কিন্তু কোথাও না কোথাও আলো আছে।'

'হয়তো আছে!' পল একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললে, 'কিন্তু কোথায়?'

'আমরা নিশ্চয়ই খুঁজে পাবো।'

'কেন আমরা গিয়ে খুঁজবো? কোথাও যদি থাকে, থাক। আমি তোমার পাশে—এইই সব, এছাড়া আর কোথাও কোন আলো নেই।'

'কিন্তু আমরা দুজনেই তো পৃথিবীর সব নয় ?'

'নিশ্চয়ই না'—অর্থহীন কথার প্রবাহকে সে আর বেশী দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইলো না। 'কিন্তু ওসব কথা এখন আর ভাবতে পারছি না। ভাবছি চিরদিন তুমি এখানে এভাবে থাকতে পারো না। আমি জানি তুমি কি ভাবো। এখুনি কিছু করা উচিত এবং আমি জানি কি করতে হবে। কিন্তু তার আগে প্রতিজ্ঞা করো, শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি আমার কথা রাখবে। পরে যদি একসাথে সুন্দর করে বাঁচতে হয়, যদি তুমি আমাকে এতটুকু ভালবাসো··· বলো, কথা রাখবে ?'

গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো এস্টার, 'রাখবো।'

পল ওর হাতটা টেনে নিলো বুকের মধ্যে। যদিও বাতাসের মতো হালকা, যেন রক্ত মাংসহীন, তবু কি আশ্চর্য উষ্ণ। সারাদিনের নিঃসীম ক্লান্তিতে তার মুদে এলো চোখের পাতা,ভাবলো কিছু ভাববে না। কিন্তু পারলো না। দিনটা যেন তার মাথার গহন তিমিরে শিকড় চালিয়ে কেবলই রক্তাক্ত করে তুলছে। আঃ এ পৃথিবী থেকে দূরে, কোন স্বপ্নলোকে যদি শান্তিতে একটু ঘুমতে পারতাম। শুধু ঘুম। নিঃশব্দ গাঢ় ঘুম।

'পল', যেন কোন সুদূর থেকে ভেসে এলো ওর কণ্ঠস্বর।

'উঁ ?'

'ওরা তাঁকে গুলি করে মারবে ?'

'আমি ঠিক জানি না, সত্যি জানি না। তুমি এখন এসব কিছু ভেবো না।'

ওর কোমল দু বাহুর মধ্যে অসহ্য ঘুমে তার বুজে এলো চোখের পাতা। চুলের মধ্যে মুখ রেখে সে ছোট্ট শিশুর মতো শ্বাস নিলো। আর এস্টার তার মুখের দিকে তাকিয়ে জেগে রইলো, যেন অতন্দ্র প্রহরী। ও ঝুঁকে পড়লো তার বুকের ওপর। অনুভব করলো এখুনি তাকে জাগিয়ে দেওয়া উচিত, নইলে বৃদ্ধ বাবা মা ভাববেন। এ যেন প্রতিমুহূর্তে নিজেরই সঙ্গে শুধু ব্যর্থ সংগ্রাম। কান পেতে শুনলো তার গভীর নিশ্বাস। কোমল ভালবাসায় ও যেন নিজেকে হারিয়ে ফেললো। ও তো তারই, এ পৃথিবীতে তার সবচেয়ে একান্ত আপন।

পরের দিন প্রভাতী সংবাদপত্রেই পাওয়া গেল এস্টারের না-পাওয়া প্রশ্নের জবাব। সবাই পড়লো যাদের গুলি করে মারা হয়েছে তাদের শেষতম তালিকা। প্রায় শেষের দিকে রয়েছে চিলে ছাদের সেই শিল্পীর নাম আর ঠিকানা।

১১

এমন কি বিষাক্ত হয়ে উঠেছে বাইরের বাতাসও।

আত্মসমর্থনের দুরন্ত জোয়ার ভেঙে পড়েছে সবশেষে, যদিও এ শহরের কেউই জানে না এর শেষ কোথায়। চরম আদেশপত্র প্রচারিত হয়েছে। একটা দিন, কয়েকটা ঘণ্টা। তারপরেই অপরাধীদের আত্মসমর্পণ করতে হবে একটি দিনের নগ্ন আলোকে। যদি না করে, তাহলে পরের দিন নিশান্তিকায় সূর্যের মুখ বুঝি ওরা আর কোনদিন দেখবে না।

'নিজেই পড়ে দেখ না...' চিপেক আঙুলে কাগজটা চেপে ধরলো। 'এমানুয়েল তো স্পষ্ট বলেছে, যারা বিদ্রোহীদের সমর্থন করবে রোমানরা তাদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করবে। লিডসের পর আমি আর কোন কিছুতেই বিস্মিত নই...'

চশমার ফাঁক দিয়ে দর্জি টেবিলে রাখা কাগজটার ওপর চোখ বোলালো। তারপর বিস্ময়ে মাথা নেড়ে বললো, 'নিশ্চয়, কিন্তু তার মানেই এই নয়..'

এর চেয়ে বেশী ওরা আর কিছু কল্পনা করতে পারে না। এ যেন প্রতিহিংসার চরম মহোৎসব, শাসনের বেলাভূমি জুড়ে মৃত্যুর আদিম উল্লাস। বিদ্রোহীদের ছায়া লক্ষ্য করে নেমে আসা গুলির শব্দ, দরজায় বুটের আঘাত, বাড়ি বাড়ি নগ্ন অনুসন্ধান আর লুণ্ঠন। চারদিকেই ইউনিফর্মের আড়ালে লুণ্ঠনকারীর অবাধ অধিকার। ঘৃণা, ভয়, ক্রোধ আর চোখের জল। ট্রাকে ইহুদী বোঝাই করে নিয়ে যাওয়ার আশ্চর্য তৎপরতা। তার সঙ্গে কামোন্মত্ত পশুর হিংস্র গর্জন, টেলিফোনের শব্দ, জরুরী সংবাদের আনাগোনা। পৃথিবীর স্বচ্ছ আলো থেকে দূরে আত্মগোপনকারী সেইসব মানুষের গোপন তথ্য। রাস্তার মোড়ে মোড়ে নতুন তালিকা, সংবাদপত্র আর বেতার থেকে সংগৃহীত নাম...অজস্র নাম আর ঠিকানা। তার পাশেই সীমান্তে শত্রুর পরাজয় আর মৃত্যুর দীর্ঘ তর্জনী। নতুন কিছু নয়। শুধু বেতারে ড্রামের বজ্র নিনাদ, ইস্তাহারের হীন প্রচারকার্যে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের নিপুণ তৎপরতা, আর প্রবাঞ্চিত ইহুদী-বলসেভিকদের বুকফাটা যন্ত্রণার করুণ দীর্ঘশ্বাস। প্রতিনিধিশাসিত সংবাদ ও তথ্য দপ্তরএর অধিনায়ক এমানুয়েল মোরাভিস, দুঃখ রাইখ যদি তোমার হয়ে তোমার দেশকে শাসন করে।

'বাঃ বেশ তো চলেছো ঘোড়ার দুলকি চালে'—শোনা গেল চিপেকের

রুক্ষ কণ্ঠস্বর। 'যদিও তোমার কেশহীন মস্তক শিশুর মতো নগ্ন, তবু আমি বিস্মিত হবো না—অধিনায়কত্বের জন্যে জার্মান সরকার যদি তোমাকে 'স্বর্ণ-কেশর নায়ক' উপাধি দেয়।'

বাতাসের স্তবকে স্তবকে ছড়ানো আতঙ্কে রোমাঞ্চিত সারা শরীর—কাল রাত্রির মধ্যে যদি অপরাধীদের খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে প্রতি দশজনের একজনকে গুলি করে মারা হবে।

সেই দিনই নতুন খদ্দের রেঝসেক আবার দোকানে হানা দিলো। কথা মতো সুটের ট্রায়াল দিতে এসে কাপড়টা টেবিলে একই অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো। বাইরের গরমে ঘেমে নেয়ে গেছে। রুমালে ঘাম মুছে একটা চেয়ার টেনে নিলো, 'উঃ যা গরম পড়েছে! আচ্ছা, আমার ওটার কদ্দূর?'

সবাই নিশ্চুপ। যেন কাজের ভারে কত ব্যস্ত। সুতরাং রেঝসেক একাই শুরু করলো—প্রথমে সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা, একগুঁয়ে চকোস্লো-ভাকিয়ার মূর্খ রাজনীতি, অভিসম্পাত দিলো ইহুদী শয়তানদের যারা আমা-দের সবাইকে টেনে এনেছে এই বিশৃঙ্খলার নরককুণ্ডে! দুঃসহ নিস্তব্ধতার মধ্যে নিজের কথায় নিজেই উত্তেজিত হয়ে উঠলো, কেঁপে উঠলো সারা শরীর। চোখদুটো ওর ঘুরে চলেছে দোকানের চারদিকে, ছোট ঘরের বন্ধ দরজার ওপর এসে থেমে গেল। তারপর পকেট থেকে একটা চকলেট বার করে মুখে পুরলো।

সে যখন কথা বলে না তাকে বেশ ক্লান্ত আর ভারি ভালো দেখায়।

দর্জি তার কাছে এসে ক্ষমা চাইলো, 'দেখছেন তো স্যার, কাজের যা চাপ আমরা সবাই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি।' মিথ্যে কথাগুলো দ্রুত বলে চললো, 'যদি কিছু মনে না করেন, পরশু কি তার পরের দিন কিংবা সোমবার...'

'বেশ তো...'গালভরা অবস্থায় রেঝসেক বললো, 'আমি না হয় সোম-বার আসবো, কিন্তু দেখবেন তার বেশী যেন দেরি না হয়।' নিজের গতিবিধির ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে উঠে পড়লো। চকলেটের খোলা বাক্সটা এগিয়ে ধরলো সবার সামনে, 'আসুন, আজকেরই তৈরি।'

এতক্ষণ চিপেক আশ্চর্য চুপচাপ ছিলো। এখন বিড়বিড় করে কি যেন বললো। এক মুহূর্ত দ্বিধার পর দর্জি না করতে সাহস পেলো না, পাছে রেঝ-সেক যদি সন্দেহজনক কোন অর্থ করে বসে। প্যাকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে

চিপেকের দিকে অপরাধীর দৃষ্টিতে তাকালো। চিপেকের দৃষ্টি তখন অন্য দিকে এবং কিছুই লক্ষ্য করলো না। দর্জি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো।

'ধন্যবাদ।'

রেঝসেক দরজার দিকে এগিয়ে এসে, গায়ে পড়া প্রতিবেশীর অন্তরঙ্গতায় একবার ফিরে তাকালো।

দরজা বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে চিপেক মন্তব্য না করে থাকতে পারলো না, 'দেখো হে, আবার বিষম লাগে না যেন।'

বহুদিন পর ছোট্ট একটি মন্তব্য দর্জিকে আহত করলো। বাইরে প্রচণ্ড উত্তাপ, ভেতরে থমথমে ভারি বাতাস—স্বাভাবিক শান্ত স্বভাবের বৃদ্ধকেও ক্রোধোদ্দীপ্ত করে তুললো।

'কি বলতে চাও তুমি?' প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত কণ্ঠে সে চিৎকার করে উঠলো, 'সব সময় তুমি কেন এমন করো বলো তো? আমাকে একটু একা থাকতে দাও। আমার একটা সংসার আছে, তার কথা ভাবতে হয়, ছেলেটাকে মানুষ করতে হবে, রুগ্ন স্ত্রী···তাছাড়া এসব তুমি বুঝবে না।'

'আমি সব বুঝি ..'আশ্চর্য কোমল চিপেকের কণ্ঠস্বর।

'তুমি কি চাও আমি ওর সাথে সহযোগিতা না করি?' অসহ্য ক্রোধে কেঁপে উঠলো দর্জির সারা শরীর, 'ধরো আমি না হয় ওর এই বাজে সুটটাই তৈরি করে দিলাম, কিংবা একটা মিষ্টি নিলাম, তাতে কি এসে গেল? এর চেয়ে তাড়াতাড়ি তো আর যুদ্ধ জয় করা যাচ্ছে না। আমি সে যোদ্ধাও নই, বীরও নই···কোন কাজেই লাগবো না।'

'কেন লাগবে না?' সদ্য তৈরি জ্যাকেটটা চিপেক ছুঁড়ে দিলো টেবিলের ওপর, 'জীবনে একদিন না একদিন নিশ্চয়ই লাগবে। অন্তত ছোট্ট একটা বীরের মতো, এতটুকু···এমন কি এই পায়জামা পরা অবস্থাতেই। তা যদি না করো জানতে হবে তুমি একটা নিমকহারাম। সবাই তো আর রবিন হুড নয়, তবু এমন একটা মুহূর্ত আসে যখন লোকে দেখে—সে একটা মানুষ, যদি সে সত্যিই কোনদিন মানুষের মুখের দিকে তাকায়।'

'কি বলতে চাইছো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না?'

চিপেক উঠে পড়লো। দর্জিকে নিয়ে এলো ছোট্ট দরজাটার কাছে। যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন কোনো রাজপুত্রের হাত ধরে নিয়ে এলো তেপান্তরের মাঠে। গলায় ফিতে ঝোলানো বিষণ্ণ ম্লান এই বৃদ্ধের জন্যে সে সত্যিই দুঃখ পেলো।

'শোন…' ফিসফিস করে চিপেক বললো, 'তোমাকে আমি হতাশ করতে চাই না। কিন্তু এখানে এমন কিছু আছে যা আমি দেখাতে চাই না এবং সেই জন্যেই বলছি এখনো যখন সব ঠিক আছে…'

সেই সন্ধ্যায় যে মানুষটি ফিরে এলো, পলের মনে হলো তিনি যেন তার বাবা নন। তাদের সামনে তিনি ঘরে এসে দাঁড়ালেন। বিবর্ণ মুখ, অশান্ত দুটি চোখ, শিথিল হাতদুটো ঝুলছে। চেয়ারে বসে অস্পষ্ট হাসির মধ্যে চেষ্টা করলেন নিজেকে অনেকটা সহজ করে নিতে। সামনে টমাটোর গরম সুপটার দিকে আনত তাঁর চোখ। মিডসেক্সের ওপর রাখা রেডিও কিংবা সান্ধ্য পত্রিকায় হাত দিতেও সাহস পেলেন না। ওরা দেখলো তিনি মুখ তুলে তাকাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, স্বাভাবিক শান্ত অভিব্যক্তিটুকু ধরে রাখার সে কি নগ্ন প্রয়াস। কিন্তু জীবনের রঙ্গমঞ্চে তিনি অনভিজ্ঞ অভিনেতা।

প্রকম্পিত শিথিল আঙুলে তাঁর চামচটা কেঁপে গেল।

'কি ব্যাপার, তোমার কি হয়েছে বলো তো?' মার উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর।

তিনি চমকে উঠলেন। বিষণ্ণ হাসির রেখা টেনে চোখ মেললেন, 'কই, না তো। কি আবার হবে?' প্লেটের দিকে তিনি আবার দৃষ্টি নামিয়ে নিলেন। 'আমার, মানে…শরীরটা কেমন যেন একটু খারাপ লাগছে, অবশ্য তেমন কিছু নয়…'

'আদা দিয়ে এক কাপ চা করে দেবো?'

'না না, এখুনি তো শুয়ে পড়বো।'

ওরা সবাই নিঃশব্দে খেয়ে চলেছে। বৃদ্ধ ঝুঁকে পড়েছেন তাঁর প্লেটের ওপর, আড়াল করে রাখতে চাইছেন ছেলের দৃষ্টি। মুখের ভাঁজে ভাঁজে খেলে যাচ্ছে অস্বস্তির নানান রেখা। পল শুনলো ওঁর গভীর দীর্ঘশ্বাস। তিনি কি সত্যিই অসুস্থ। চারদিক নিস্তব্ধ। শুধু কাঁটাচামচের ঠুং ঠাং, ঘড়ির টিকটিক শব্দ একসঙ্গে মিশে হারিয়ে যাচ্ছে বাতাসে।

কবরের মতো একরাশ নিতল নিস্তব্ধতা।

অসহ্য নিস্তব্ধতার মাঝে শোনা গেল মার বিবর্ণ কণ্ঠস্বর, 'রোসি আমাদের জন্যে কিছু শুয়োরের মাংস পাঠিয়েছে।'

'খুব ভালো। মনেহয় যুদ্ধের পরে আমরাও ওকে কিছু পাঠাতে পারবো।'

'তুমি কিন্তু কিছু খাচ্ছো না।'

'পারছি না। আজ আমার একটুও খিদে নেই', বিব্রত কণ্ঠে তিনি স্বীকার করলেন। হঠাৎ চমকে উঠতেই চামচটা সশব্দে প্লেটের ওপর পড়ে গেল। 'দরজায় কে যেন কড়া নড়েলো, তুমি শুনতে পাও নি?' রুদ্ধ তাঁর কণ্ঠস্বর।

তিনি উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন, 'তাহলে কি...'

মা আপত্তি জানালেন, 'এখন আবার কে আসবে?'

'কই, আমি তো কিচ্ছু শুনিনি', বিস্মিত হলো পল। বিদ্যুত চকিত পায়ে সে অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল। একটানে খুলে ফেললো বারান্দার দরজাটা। না, বাবার শ্রুতিশক্তি তাঁকে প্রতারিত করেনি।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একজন প্রতিবেশিনী, যার কাছে ইস্ত্রিটা চাইতে এসেছেন। তাঁর উপস্থিতি মুহূর্তের জন্যে রান্নাঘরের নিস্তব্ধতাকে দুহাতে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিলো, আর পলও সুযোগ পেলো তার দৈনন্দিন খাবার সংগ্রহের। মা এখন দরজার সামনে প্রতিবেশিনীর সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত। দ্রুত হাতে পল আলমারি খুলে রুটির কয়েকটি টুকরো কেটে নিলো। মিড-সেফের ওপর দেখতে পেলো কাগজে জড়ানো ঝলসানো শুয়োরের মাংস। কিন্তু তার থেকে নিতে সে সাহস পেলো না। ঘরে এসে নতুন সার্টটা পরে নিলো, বুকসেলফ থেকে টেনে নিলো একটা বই। প্রতিদিনের মতো ক্যানারির ছোট্ট খাঁচায় হাত ঝুলিয়ে আদর করলো। তারপর মায়ের কঠিন দৃষ্টি এড়িয়ে দ্রুত পায়ে সে নেমে এলো।

হলঘরের অস্পষ্ট অন্ধকারেও দেখতে পেলো দরজার সামনে কাব্যার্ডের ওপর সাদা একটা প্যাকেট। একটু আগেও তো ছিলো না। আশ্চর্য! অন্ধকারেই হাত দিয়ে সে অনুভব করলো—দ্রুত হাতে কাটা কিছু মাংস আর রুটির বড় দুটো টুকরো। কিছুই বুঝে উঠতে পারলো না। অবাক চোখে সে যখন ফিরে তাকালো বুঝতে পারলো পেছনে দরজার সামনে বাবা দাঁড়িয়ে, অন্ধকারে একটা ছায়ার মতো। নিশ্বাস চেপে রাখতেও বুঝি কষ্ট পাচ্ছেন।

রুদ্ধ বিস্ময়ে পল স্তম্ভিত, 'বাবা!'

'চুপ।' অস্পষ্ট মৃদু একটি কণ্ঠস্বর। ভীরু চোখে রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে তিনি ইশারা করলেন, যেখানে তার স্ত্রী আর সেই প্রগলভা মহিলাটি তখনো অনর্গল বকবক করে চলেছে। 'নিয়ে যাও।'

'আপনি, মানে...সব জানেন?'

'আর একটিও কথা নয়, যাও...'অমোঘ তাঁর কণ্ঠস্বর। চকিতে তিনি

পলের কাঁধ ধরে নাড়া দিলেন, যেন তাকে জাগিয়ে দিতে চান কিংবা কোন কিছুর আঘাত থেকে সংগোপনে আড়াল রাখতে চান। 'মা কিছু জানতে পারবে না, বুঝেছো? তাছাড়া ও অসুস্থ, তুমি তো জানো ওর শরীরের যা অবস্থা। আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না, কিছু জানতেও চাই না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি ফিরে এসো, বরং আলোচনা করা যাবে—কি করা উচিত। কিন্তু এখন আর কিইবা করার আছে!'

অন্ধকার পথে সে দ্রুত হেঁটে চললো, যেন আহত নিঃসঙ্গ সৈনিকের কাঁধ থেকে নেমে গেছে ভারি পাথর। আশার ক্ষীণ একটা আলোয় ভরে উঠছে সারা বুক। অস্থির একটা চঞ্চলতা যেন কেবলই তাকে জড়িয়ে ধরছে পায়ে পায়ে। হ্যাঁ, এই তো সেই পথ।

আর একটু আস্তে চলা উচিত, আমি যেন ফেনিল সমুদ্রস্নাত উন্মত্ত পাখির ডানায় ভর করে উড়ে চলেছি, রাস্তার সবাই ফিরে তাকাচ্ছে। সে যেন স্পষ্ট শুনতো পেলো তার হৃদয় স্পন্দন—এক দুই এক দুই। বিদায় সূর্যের আলোয় উত্তপ্ত বাঁধানো পাথরে তার স্যাণ্ডেলের শব্দ। হাতের প্যাকেটা যেন কত হালকা। সন্ধ্যার এই দখিনা বাতাসে সে যেন এখুনি উড়ে যাবে ঝরা পাতা কিংবা ছোট্ট একটা পালকের মতো।

দ্রুত পায়ে সে যখন পুরনো বাড়ির বাইরের ভারি দরজাটার কাছে এসে পৌঁছলো, নিচের ফ্ল্যাটে জানলার কাছে শুয়ে থাকা পুসিটা অলস চোখে হাই তুললো। ঝড়ের বেগে সব সিঁড়িকটা পেরিয়ে সে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। এখন আর তাকে আদৌ উদ্‌ভ্রান্ত বালকের মতো দেখাচ্ছে না। ওখানে দাঁড়িয়ে নিজেকে শান্ত করার জন্যে বুক ভরে নিলো এক ঝলক মিষ্টি বাতাস।

ঠিক তখনি অস্পষ্ট সবুজ আলোয় সে দেখলো দরজার গায়ে কি যেন একটা রয়েছে। না না, এ স্বপ্ন! চোখ বন্ধ করলো, কিন্তু মনে হলো তখনো রয়েছে। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালার আগে চারদিক ভাল করে দেখে নিলো। সহসা হিমেল একটা প্রবাহ কেঁপে গেল তার সারা দেহে। আনাড়ি ভারি হাতে চক দিয়ে আঁকা একটা তারা। পরস্পর উল্টো করে রাখা দুটি ত্রিভুজ। খুব বড় নয়, অথচ এত স্বচ্ছ যেন চোখে এসে বেঁধে। তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার ঢেউগুলো ছুটে এলো একসাথে। এর অর্থ কি? তাহলে কি এই সুযোগ? মূর্খ, তা হতে

পারে না। কিন্তু কেমন করে ওরা জানলো ? কেন, কেন আর কয়েকটা দিন তাকে সময় দিলো না। আঃ আমি কি পাগল হয়ে যাবো! কেন, কেন ওরা …এই শেষ, যাকিছু ভাবাব দ্রুত ভেবে নেওয়ার এখনি সময়…ইহুদী! অপলক চোখে সে তারাটার দিকে তাকিয়ে রইলো। কানের কাছে অসংখ্য শিঙার ধ্বনি, সব কিছুই যেন ভেঙে পড়ছে অতল অন্ধকারে! পায়ের নিচে ধূসর কণিকাগুলো কেবলই জ্বলছে, ভস্মের শেষ চিহ্নটুকুও হারিয়ে যাচ্ছে বাতাসে। আঃ সব, সব শেষ!

দুহাতে কপাল চেপে ধরলো পল। প্যাকেটটা খসে পড়লো মাটিতে। নিজেকে আপ্রাণ ধরে রাখতে চাইলো। এইই যথেষ্ট—বুঝি আর ভাবা যায় না। কালই সব শেষ! প্যাকেটটা কুড়িয়ে নিলো। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ভাবনা-গুলোকে সে উড়িয়ে দিতে চাইলো। এক ঝলক রক্ত চলকে উঠলো সারা মুখে। পকেট থেকে রুমাল বের করে খড়ির লেখাটা মুছে দিলো।

ঘরের ভেতরে ঘেরাটোপের ছোট্ট বাতিটা জ্বলছে। যদিও বাইরে অন্ধকার এখনো তেমন করে নামেনি, তবু জানলাগুলো সব বন্ধ। পল ওকে দেখতে পেলো না। দরজার হাতলে হাত রেখে সে দাঁড়ালো। অসম্ভব! নিজের চোখেও বুঝি বিশ্বাস করা যায় না।

'এস্টার!'

মৃদু একটা নিশ্বাসের শব্দ। তারপর সে ওকে দেখতে পেলো। খোলা দর-জার পেছনের দেওয়াল ঘেঁসে ও দাঁড়িয়ে। বাইরে যাবার সম্পূর্ণ পোশাকে সুসজ্জিতা। হলুদ তারাওয়ালা সেই কোট, হাতদুটো দুদিকে ঝোলানো। নিবিড় কালো চোখদুটি তার দিকে মেলে দিয়ে ও নির্নিমেষ।

'কি হয়েছে এস্টার? নিশ্চয়ই তুমি…'

করুণ, ভালবাসার ছোট্ট একটা তরঙ্গ উঠে এলো তার বুক বেয়ে। দুহাতে জড়িয়ে সে ওর হিমেল ঠোঁটে চুমু দিলো।

'কেন তুমি লুকতে চাইছো? পল তো তোমার কাছে! এই দেখ, তোমার জন্যে কি এনেছি, এসো…কি ব্যাপার, কিছু হয়েছে?' সে যখন ওকে ছেড়ে দিলো, সোফার একপ্রান্তে এসে ও বসলো। হাঁটুদুটো সুসংলগ্ন, পুতুলের মতো স্থির চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে ও অপলক। হাতের ভাঁজে গোটানো রুমাল। সে ওর গলা জড়িয়ে মৃদু নাড়া দিলো, 'এই!'

শোনা গেল ওর গভীর দীর্ঘশ্বাস, 'কে যেন এসেছিলো!'

'নিশ্চয়ই আমি...'

'এখন নয়, একটু আগে। আমি জানি তুমি নও।'

'তুমি নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখেছো। কে আবার আসবে ?'

'না, আমি তার নিশ্বাসের শব্দ শুনেছি। বিশ্বাস করো। জানলার ফাঁক দিয়ে সে দেখছিলো...'

'তোমাকে দেখতে পেয়েছে ?'

'জানি না। হয়তো পায়নি।'

সে ওর কোটটা খুলে দিলো। টেনে আনলো সোফার মধ্যে।

'হয়তো ও তোমার কল্পনা। অবশ্য এখন আর কিছুই এসে যায় না। কেননা কালই তুমি এখান থেকে চলে যাবে। এই, কি বলছি শুনতে পাচ্ছো ?'

সে ওর পাশে এসে বসলো। তারপর নিপুণ হাতে এঁকে চললো কল্পনার নানান ছবি। কাল ওকে শহরে কাকিমার ওখানে নিয়ে যাবে। ট্রেনে খুব বেশী দূর নয়। অবশ্য ট্রেনে ওকে যেতে দেবে না। কিন্তু হলুদ তারাটা খুলে পোশাকটা একটু বদলে নিলে কেউ জানতে পারবে না। কিচ্ছু না। দেখো তোমার কোন ভয় নেই। অন্তত কয়েকদিন সেখানে নিরাপদে থাকা যাবে, আর জায়গাটা সত্যিই ভারি সুন্দর। ছুটির দিনে আমি বেশ বেড়াতে যাবো। কাকিমা খুব ভালো। তারপর দেখো না কি হয়—তোমার ওখানে খুব ভালো লাগবে। চারদিকে শুধু গাছ, মেঘ আর স্বচ্ছ বাতাস। তোমার এখন খোলা বাতাস দরকার। তারপর আমি যখন যাবো দুজনে একসঙ্গে বেড়াবো। শুধু তুমি আর আমি—আমরা দুজনে একসঙ্গে আকাশ দেখবো, নীল আকাশ। এখন ভাবতে কেমন অবাক লাগছে, তাই না ?'

নিঃশব্দে এস্টার শুধু শুনে গেল—হৃদয়ের সবটুকু রঙে আঁকা সুন্দর একটা রঙিন ছবি। ঘরের দেওয়াল দরজা জানলা সব যেন উধাও হয়ে গেছে।

ওখানে এমন সুন্দর সাঁতার কাটা যায়, দুটো সাঁকো আছে, জানো ! এই, তুমি সাঁতার জানো ? দেখো ডুবে যেও না যেন। আচ্ছা, ডুবে গেলে আমি কি করবো ? অন্তর্লীন গভীর শব্দগুলো যেন তার সমস্ত ভয় ভাবনাকে নিঃশেষে মুছে দিলো। আর ও তার ছেলেমানুষি আশঙ্কায় নিঃশব্দে না হেসে পারলো না।

'আচ্ছা, যদি আমাদের ধরে ফেলে ?'

'কক্ষনো না। ও কথা তুমি ভাবছো কেন ? তাছাড়া আমরা তো একসঙ্গে

থাকবো। তুমি কিন্তু একটুও ভয় পেও না, পাবে না বলো? দেখো, কালই আমরা চলে যাবো।'

দুজনেরই কাছে ঘরটাকে আশ্চর্য আলোকিত মনে হলো।

সে আরো ঘন হয়ে এলো ওর কাছে। নিভিয়ে দিলো ছোট্ট বাতিটা। আর এস্টার যেন তার নিবিড় দুবাহুর কোমল স্নিগ্ধতায় গলা মোমের মতো ঝরে ঝরে পড়লো, মুদে এলো চোখের পাতা। পল অনুভব করলো ওর সারা দেহ। মুখটা হারিয়ে দিলো ওর চুলের অতল অন্ধকারে, ভেসে এলো পরিচিত সেই মিষ্টি গন্ধ। ও নিশ্চুপ, তবু পরস্পর যেন কথা কইছে ভাষাহীন নিঃশব্দ সংগীতের সুরে—সেই ভোর, সেই মেঘ, সেই অরণ্য আর উত্তর মণ্ডলের নক্ষত্রপুঞ্জ—ওরা যা ভেবেছে, যা দেখবে, একসঙ্গে বেঁচে থাকার সবটুকু আনন্দ, যা ভরিয়ে দেবে সংগীতের সেই সুর। কাল, হয়তো স্বপ্ন, তবু তো অসম্ভব নয়। অনেক দূর কোথা থেকে ভেসে আসছে জানলার শার্সি ভাঙার শব্দ। আর তীক্ষ্ণ একটা কণ্ঠস্বর। উন্মত্ত মাতালের স্খলিত চিৎকার। হয়তো রেঝসেক মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে। কিন্তু শব্দটা মনে হচ্ছে ভেসে আসছে যেন অনেক দূর থেকে। না না, ওরা এখন আর এসব কিছু ভাববে না।

'পল', সে শুনতে পেলো যন্ত্রণাবিদ্ধ ওর করুণ কণ্ঠস্বর। 'তুমি জানো, আজই আমি চলে যাচ্ছিলাম?'

'কোথায়?'

'জানি না। হয়তো টেরাঝিনে বাবামণি মামণিকে খুঁজতে। সত্যি, ভীষণ ভাবে আমি ওদের হারিয়েছি, কোন খবরই পাইনি। জানি না কোথায় আছে। তোমার কি মনে হয় ওরা এখনো ওখানে আছে? তাহলে আমায় চিঠি লিখছে না কেন?'

কি বলবে সে। এ প্রশ্নের কোন উত্তর তার জানা নেই। সে চায় না মিথ্যে বলে ওকে আনন্দ দিতে। তবু ওর গভীর আচ্ছন্ন চিন্তাকে সে ভয় পায়।

কিন্তু আমি চলে যেতে পারলাম না পল, সত্যিই পারলাম না। আমি যে তোমাকে ভালবাসি। সব সময়ই তোমাকে আমার বুকের মধ্যে অনুভব করি, এমন কি যদি বাবামণি মামণিকে হারাই, তবু তুমি থাকবে আমার হৃদয়ে, আমার সব কিছুর অনেক গভীরে। পৃথিবীতে এর চেয়ে সুন্দর কিছু আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। তোমার সবটুকুকে আমি ভালবাসি, পল। তোমার ঠোঁট, তোমার স্বর, তোমার এলোমেলো রুক্ষ চুল, তোমার হৃদয়—যখন তুমি

নিবিড় হয়ে আমার কাছে থাকো, আমি শুনতে পাই তোমার স্পন্দন, তোমার শিরায় রক্তের প্রতিটি স্রোত। কপালের এই রেখাগুলো···তুমি যখন ক্লান্ত হয়ে ভাবো, এত ভালো লাগে তোমার হাতটা আমার হাতের মধ্যে নিতে, তোমার নিশ্বাস···আঃ মৃত্যুর পরেও আমরা যদি বেঁচে থাকি, যদি তুমি আমাকে এখনো ভালবাসো···'

'এ তুমি কি বলছো ?'

'তাহলে আমি পৃথিবীর কোন কিছুতেই ভয় পাই না। বিশ্বাস করো, তুমি ছাড়া অন্য কারুর সন্তানের মা হওয়ার কথা আমি কল্পনাই করতে পারি না।'

দুহাতে আরো নিবিড় করে সে ওকে জড়িয়ে ধরলো। রুদ্ধ তার নিশ্বাস, বুঝি ভয় পেলো এর পরে ও কি বলবে। এর চেয়ে নিস্তব্ধতা ঢের ভালো। সারা বুক জুড়ে অবাক রহস্যময় কি যেন একটা কেঁপে উঠছে। ওর ভালবাসা যেন তাকে টেনে নিয়ে চলেছে কোন সুদূর অতলান্তে, আর সে এখন ওকে চিনতে পারছে না। দুহাতে ভর দিয়ে সে নিজেকে টেনে তুললো। অস্পষ্ট মৃদু শব্দগুলো মালার মতো তখনো তার গলার চারদিকে। ঝড় কাঁপিয়ে উন্মত্তের মতো স্পন্দিত হয়ে উঠলো সারাবুক।

'এই শুনতে পাচ্ছো, ওঠো।'

'পল !'

'বলো।'

সমস্ত শক্তি দিয়ে এস্টার তাকে আঁকড়ে ধরলো, ঠোঁট দুটো চেপে ধরলো পলের রুক্ষ চিবুকে। এখন সে শুনতে পেলো ও কি বলতে চায়।

'আমার সবটুকু তুমি নাও পল, এখনি···লক্ষীটি, আর দেরি করো না···'

ওরা এখন দিগন্তলীন সীমান্তেরও ওপারে। সময় বয়ে চলেছে স্পর্শবিহীন আপন মনে। আর এস্টার, বিনম্র পাখির ক্লান্ত ডানার মতো আনত লজ্জায় তাকে উজাড় করে দিলো ওর সমস্ত হৃদয়। তার দুবাহুর মধ্যে ওর সমস্ত অবয়ব প্রজ্বল পতঙ্গের মতো গলে গলে পড়ছে, হারিয়ে যাচ্ছে, মুছে যাচ্ছে সমস্ত সত্তা। ওর বুকের মধ্যে হারিয়ে যেতে যেতে সে শুনতে পেলো সেই অস্পষ্ট আর্তনাদ—পল, পলি, প্রিয়তম আমার !

ওপর তলা থেকে ভেসে আসছে কার যেন কণ্ঠস্বর। জানলায় শার্সি ভাঙার ঝনঝন শব্দ, দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ। জানলার নিচে অন্ধকার গলিতে কে যেন হোঁচট খেয়ে অশ্লীল একটা গাল দিলো। তারপরেই নিস্তব্ধ। চারদিক

জুড়ে নেমে আসা নিভন্ত নিস্তব্ধতা। শুধু ইঁদুরের খুটখাট, দেওয়ালের ওপারে পেণ্ডুলামের একটানা শব্দ, টিকটিক…টিকটিক…

তারপর সবকিছুই আবার ফিরে এলো ভাটার টানে। এখনো ওদের ভাষা-হীন নিঃশব্দ বিস্ময়গুলো ভালবাসার আশ্চর্য করপুটে অবাক চোখে মেলে আছে। সে ওর আবরণহীন শুভ্র বুকে মুখ রাখলো। নিশ্বাস প্রশ্বাসে ফুলে ফুলে উঠছে নগ্ন স্তন দুটি। বন্ধ চোখ, তবু সারা দেহে সে এখনো অনুভব করতে পারছে ওর মৃদু স্পন্দন। অন্ধকারের ওপার থেকে ভেসে আসা ওর আঙুলের স্পর্শ, ওর চুলের গন্ধ, ওর চুম্বন, ওর ভালবাসা, ওর সমস্ত অবয়বের কোমল স্নিগ্ধতা। শহরের এই চার দেওয়ালের মাঝে নিজেদের হারিয়ে অনেক অনেক-ক্ষণ ওরা শুয়ে রইলো, যেন কোন গহন জলরাশির মধ্যে হারিয়ে যাওয়া দুটি উপল। কয়েকটি ঘণ্টা যেন কয়েকটা যুগ কিংবা নক্ষত্রপুঞ্জের দুরন্ত নির্ণয়ের সেই আলোকবর্ষ।

রেডিয়াম দেওয়া উজ্জ্বল ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে সে চমকে উঠলো।

বাইরে এখন রাত্রি।

ওর নিবিড় আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে ধীরে ধীরে পল উঠে দাঁড়ালো। তারপর আলোটা জ্বেলে দিলো। আশ্চর্য, কিছুই বদলাইনি, সেই একই টেবিল, সেই চেয়ার, সেই ঘর। সে ওর দিকে ফিরে তাকালো।

এস্টার ঘুমিয়ে পড়েছে।

অস্পস্ট আলো এসে পড়েছে ওর চুলে।

পল ঝুঁকে পড়লো, রুদ্ধ তার নিশ্বাস। নির্নিমেষ চোখে সে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। ছোট্ট শিশুর মতো অমল একটা হাসির রেখা, ঠোঁট দুটো মৃদু কাঁপছে। তারপর ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও বালিশে মুখ ঢাকলো। সে ওর কপালে, ঘন চুলে, দুই স্তনের মাঝে ছোট্ট চুমু দিলো। সহসা ঘুমের মধ্যেই আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে ও ব্লাউজটা টেনে দিলো নগ্ন বুকে। সন্তর্পণে পল কম্বলে ঢেকে দিলো ওর সারা দেহ। তারপর চোরের পায়ের মতো নিঃশব্দে এগিয়ে এলো দরজার কাছে। একবার ফিরেও তাকালো না।

একটানে দরজাটা সে খুলে ফেললো। তারপর হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

১২

দুম্। রাত্রির নিস্তব্ধতা কাঁপিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল একটা গুলির শব্দ। তারপরেই নিস্তব্ধ। তখনো অন্ধকার। উজ্জ্বল তারা ভরা নগ্ন রাত অনেকটা এগিয়ে এসেছে ভোরের দিকে। রাস্তায় একটিও বাতি জ্বলছে না।

নিঃশব্দ ঘুমের মধ্যে গুলিটা বিদ্ধ হলো যেন অনেক অনেক দূরে। অথচ ঘুম থেকে জেগে উঠলে মনে হবে—পর মুহূর্তেই আরো একটা গুলির শব্দ, রাত্রির নিস্তব্ধতা কাঁপিয়ে ঝনঝন করে ভেঙে পড়লো, আরো আরো অজস্র মেশিনগানের শব্দ। খট্ খট্···খট্ খট্!

তারপরেই অন্ধকার নির্জন রাস্তাটা আবার উদাস নিস্তব্ধতায় ভরে গেল।

সহসা খুব কাছেই, আকাশের বুক চিরে স্খলিত বিদ্যুতের মতো বারুদের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রচণ্ড শব্দে ফেটে পড়লো বন্ধ জানলা শার্সির গায়ে। প্রতিধ্বনিত হলো রাস্তার অলিতে গলিতে, গভীর খাদে, বাড়ির অন্ধ দেওয়ালে—যেন যন্ত্রণাহত বিদীর্ণ পাখায় ডানা ঝাপটে মরা একটা কালো দাঁড়কাক। জানলার শার্সিগুলো আবার ঝনঝন করে কেঁপে উঠলো। শহরের বুক থেকে উঠে আসা ঝড়ের শব্দ, পাঁজরে পাঁজর জড়ানো নিঃসীম ভয় আর জানলার ওপারে নিঃস্ব প্রেতের মতো গাঢ় অন্ধকার। নিদ্রালস ঘুম জড়ানো চোখে প্রথমে কিছুই বোঝা যাবে না।

বাইরে কি হচ্ছে? কোথায়? যেন খুব কাছেই, নদীর এপারে···

পাশের ঘরে মার অশান্ত বিলাপ। পলের ঘুম ভেঙে গেল। আগেই ওঁরা বিছানায় জেগে উঠেছেন। গুলির প্রতিটা শব্দে মার চকিত আর্তনাদ—হা ঈশ্বর!

বিছানা ছেড়ে পল লাফিয়ে উঠলো। খালি পায়ে টলতে টলতে গিয়ে দুহাতে জানলাটা খুলে ফেললো। কিছুই বুঝতে পারলো না। জানলার চৌকাঠে হাত রেখে রাস্তার দিকে ঝুঁকে পড়লো। তখনো অন্ধকার। ছাদের ওপারে রাত শেষের তারাগুলো ম্লান। অন্যপারের জানলায় ফুলদানির পাশে উৎকণ্ঠিত বিবর্ণ কয়েকটি মুখ।

চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম।

সহসা বিদ্যুৎ বেগে সে ঘরের মধ্যে ফিরে এলো, শুধু একটি ভবনা—ওর কাছে যেতে হবে। এখনি। বিছানার সামনের আলোটা জ্বলেই সঙ্গে সঙ্গে

আবার নিভিয়ে দিলো—ওপার থেকে প্রচণ্ড শব্দে কে যেন ফেটে পড়লো : ব্ল্যাক আউট। আলোটা নিভিয়ে দাও। গলির ওপার থেকে আসা শব্দটা তাকে নখে নখে ক্ষত বিক্ষত করলো, মনে হলো কত কাছে ঠিক যেন পর্দার ওপাশে। আদিম উন্মত্ততায় জানলার শার্সিগুলো আবার ঝন ঝন করে কেঁপে উঠলো। বারুদের তীক্ষ্ণ গন্ধ। পাগলের মতো সারা ঘরময় সে ঘুরলো, আঁকড়ে ধরতে চাইলো তার রঙিন স্মৃতিগুলোকে। পায়জামা, সার্ট, স্যাণ্ডেল। অন্ধকারে খালি পায়ে স্যাণ্ডেলটা সে অনুভব করলো। জানলায় কাচ ভাঙার শব্দ, শিশুর কান্না, মার আর্তনাদ, সব সব ডুবে গেল দুরন্ত ঝড়ে। ফিরে এলো তার চেতনা—ওর কাছে! এখনি!

বাঁশির তীক্ষ্ণ শব্দ, সাথে সাথে রাজপথে মিলিটারী ট্রাকের গুরু গর্জন। রাত্রির অন্ধকার কাঁপিয়ে ওরা এগিয়ে চলেছে নদীর দিকে, রণাঙ্গণে। আরো ট্রাক, বাঁশির শব্দ—দুম্ দুম্!

ছোট ঘরের দরজা খুলে হলঘরের বাতিটা সে জ্বালিয়ে দিলো, দেখলো বাবার সামনে দাঁড়িয়ে। জীর্ণ দেহ। এলোমেলো রুক্ষ চুল, ক্লান্ত বিষণ্ণ দুটি চোখ। জমে যাওয়া হিমেল বাতাসে দুজনেই কাঁপছে। বাবা! পাশ কাটিয়ে পল সিঁড়ির দরজাটা খুলে ফেললো। তিনি কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল। সদর দরজার ভারি কড়াটা সজোরে টানলো। চাবি দেওয়া। সমস্ত শক্তি দিয়ে সে আবার টানলো।

অসম্ভব!

ঠিক পেছনেই মানুষের কালো একটা ছায়া, পলের হাত ধরে টানলো। পল ওর মুখ দেখতে পেলো না। কণ্ঠস্বরে চিনতে পারলো—বাড়ির দরোয়ান।

'কোথায় যাচ্ছো?'

'দরজা খোল!' সমস্ত শক্তি দিয়ে পল ধাক্কা দিলো। কিন্তু খুললো না। লোকটি বজ্রমুঠিতে তাকে দরজার কাছ থেকে টেনে আনলো। উন্মত্ত ক্রোধে পল নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলো। 'না না', দরজা খোল, শুনতে পাচ্ছো, দরজা খোল। আমাকে যেতে হবে, দোহাই তোমার, দরজা খোল!'

'এখন বাইরে যাবে! তুমি কি পাগল হয়েছো? শুনতে পাচ্ছো না গুলির শব্দ?' লোকটি তার কাঁধ ধরে নাড়া দিলো, 'ফিরে যাও পল, কাউকে আমি এখন বাইরে যেতে দেবো না। তাছাড়া বেশী দূর তুমি যেতেও পারবে না, দেখলেই গুলি করবে। চারদিক ঘিরে ফেলেছে ওরা, হয়তো…'

দুহাতে সে মাথা চেপে ধরলো। শোনা গেল বাঁশির তীক্ষ্ণ শব্দ। কপাল রাখলো দরজার গায়ে। কঠিন হিমেল একটা স্পর্শ। দুহাতের আঙুলে কড়াটা আঁকড়ে ধরে সমস্ত শক্তি দিয়ে টানলো। দরজা খোল। দরজা খোল! সে শুনতে পেলো তার দাঁতের বিচিত্র একটা শব্দ। পা দুটো আশ্চর্য দুর্বল। ধরে রাখতে পারলো না তার ভেঙে পড়া বুক ফাটা যন্ত্রণার তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। এখন। এখন কি হবে? ওকে যদি খুঁজে পায়, অন্ধকার থেকে টেনে আনবে রাস্তায়। তারপর তাকেও। কালরাত্রি। অন্ধকার বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার সঙ্গে। না না—দুঃসহ যন্ত্রণায় টনটন করে উঠলো সারা বুক। বন্ধ হয়ে এলো চোখের পাতা। তার পেছনে, ঘরের ভেতর থেকে ভেসে এলো অস্পষ্ট কয়েকটি কণ্ঠস্বর। কি হয়েছে কি? কে যেন ফিসফিস করে বললো। উত্তর দিলো অন্য আর একটি কণ্ঠস্বর—হয়তো পাগল হয়ে গেছে। আহা, বাছারে। না না, অমন করে বলো না, বরং ওকে বিছানায় শুইয়ে দাও...দাঁড়াও আগে কি হয়েছে বলতো? চুপ করো সবাই।

নম্র একটি হাত নেমে এলো কাঁধে, হাত বুলিয়ে দিলো চুলের মধ্যে। সে বুঝতে পারলো হাতটা কার। বিবর্ণ মুখ, অবাক চোখ মেলে সে ফিরে দাঁড়ালো। অশ্রুধারা নেমে এলো চিবুক বেয়ে, যদিও কেউ তা লক্ষ্য করলো না। বাবা! বাবার কাঁধে সে মাথা রাখলো। শুনতে পেলো কাঁপাকাঁপা অস্পষ্ট কয়েকটি মৃদু শব্দ, 'এখন নয় পল, পরে, হয়তো কিছুই হয়নি, হয়তো ...এখন আমাদের বাইরে বেরোনো উচিত নয়...মা নিশ্চয়, তুমি তো জানো সে অসুস্থ, তাছাড়া ওরা এখন এই রাস্তায়!'

আকাশ বিদীর্ণ করা প্রচণ্ড শব্দে আর কিছুই শোনা গেল না।

শুধু শোনা গেল ঝড়ের অশান্ত আর্তনাদ। এস্টারও শুনলো তার গোপন অন্ধকার থেকে। মনে হলো খুব কাছেই, দেওয়ালের ঠিক ওপারে। তবে কি ওর জন্যে, না না। কিছুই বুঝতে পারলো না। মাঝে মাঝে দুহাতে শুধু কান চেপে ধরলো।

হলুদ তারাওয়ালা কোটটা ও পরে নিলো। তারপর পা গুটিয়ে সোফার পেছনে নিজেকে লুকিয়ে ফেললো। ছোট্ট সুটকেসটা নিবিড় আঁকড়ে ধরলো, যাতে কেউ না ছিনিয়ে নিতে পারে। অর্ধনমিত দুটি চোখ, শুধু নিঃশব্দ ঠোঁট দুটো মৃদু কাঁপছে। বাবামনি, মামনি...পল, পলি, প্রিয়তম আমার। পুরনো

বাড়ির জীর্ণ দেওয়াল কাঁপিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল কয়েকটি গুলির শব্দ। ছিঁড়ে গেল ওর তন্ময় আচ্ছন্ন চেতনা, কল্পনার যত রঙিন ছবি। সব, সব শেষ —শুধু তিক্ত লবণাক্ত কয়েকটি অশ্রু, আর একরাশ ক্লান্ত অবসাদ।

পল।

অন্ধকারেই ও উঠে বসলো। যদিও ভোর হয়ে এসেছে—ঘরের অতল অন্ধকারে অস্পষ্ট আলোকিত জানলার দিকে ও অপলক চোখ তাকিয়ে রইলো। কিছু ভাবতেও বুঝি ক্লান্তি নামে। ও কিছু ভাবলো না। শুধু ওর চারদিকে ম্লান একটা বিষণ্ণতা। জানলা দিয়ে আলো এসে পড়েছে ঘরের ভেতরে। নিশান্তিকা শেষের স্বচ্ছ একটি ভোর। যেন ছায়ালোকের অতল অন্ধকার থেকে পৃথিবী ফিরে এসেছে তার আপন সত্তায়। বাইরের বারান্দায় অস্পষ্ট আলোকে মানুষের দেহরেখাগুলি ধূসর প্রতিমূর্তির মতো। পাগলের মতো ওরা হাত নাড়ছে, যেন জানলার ওপারে কাল্পনিক যত ছায়ানট। বাড়িটা জেগে উঠেছে, মুছে গেছে দুচোখের ঘুম। ঝুলনো বারান্দায় ওরা ঝুঁকে পড়েছে, ভোরের প্রথম হিমেল বাতাসে কেঁপে উঠেছে সারা দেহ।

জানলার কাছে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ও কান পেতে রইলো। একটু নিস্তব্ধতার পরেই শুনতে পেলো—পুরুষের রুক্ষ ভারি গলা, নারীর কণ্ঠস্বর, ভয়ার্ত করুণ বিলাপ, সদ্য ঘুম ভেঙে জেগে ওঠা শিশুর কান্না। কোথায় যেন দরজা খোলার আওয়াজ। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। মানুষ!

দ্রুম্ দ্রুম্।

কয়েকটি গুলির শব্দ। নিস্তব্ধতার পর মুহূর্তেই রাইফেলের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, মেশিনগানের আকাশ কাঁপানো বজ্রনিনাদ। ভয়ে পাখিরা নীড় ছেড়ে উড়ে গেল।

বাইরে কে যেন বললো—কামানের শব্দ, আমি সামনে থেকে শুনেছি। শহরে? বাজে কথা। কেনই বা মিছিমিছি ছুঁড়তে যাবে? আমি বলছি··· অসম্ভব। তা জানি না, তবে কামানের শব্দ। এবং খুব কাছেই···হয়তো নদীর এধারেই···না, ওটা প্রতিধ্বনি! শুনলে না, এক্ষুনি তো হলো!···ওখানে কি হয়েছে বাপি? এখনো কিছু হয়নি, এইতো সবে শুরু।···আহা, আমি যা বলছি তাই···ওরা কি পাগল হয়ে গেল নাকি? খট খট···দ্রুম্। ভেতরে আয় ভেতরে আয় বলছি···

রাস্তা থেকে কে যেন এলো। জীর্ণ সিঁড়িতে প্রতিধ্বনিত হলো ভারি পায়ের

শব্দ। সিঁড়ি পেরিয়ে ঝুলনো বারান্দার নিচে ঠিক জানলার সামনে ভিড়ের মাঝে এসে দাঁড়ালো। সবায়ের একই তীক্ষ্ণ প্রশ্ন : বাইরে কি হয়েছে কি?'

'ঠিক জানি না, তবে শুনলাম ওরা তাদের ধরে ফেলেছে…'

'কাদের? কাদের ধরেছে?'

'তাও জানো না! যারা হেড্রিখ ধ্বংসের জন্যে বুকে বুক দিয়ে সংগ্রাম করছে …রাসেল স্ট্রীটের অর্থডক্স গির্জায় ওরা তাদের ঘিরে ফেলেছে।'

'ওটা কি খুব কাছেই?'

'চুপ, চুপ করো! এখানে দাঁড়িও না, ভেতরে যাও সব। শুনছে না রাস্তায় গোলমাল…'

অন্য ফ্ল্যাট থেকে কে যেন ছুটে এলো, 'জার্মানরা সমস্ত বাড়িটা ঘিরে ফেলেছে। আমাদেরও—জানলা দিয়ে দেখ, রাস্তাটা ভরে গেছে…ওরা এসেছে ট্রাক বোঝাই, কাঁধে রাইফেল।'

সত্যি। মুহূর্তের জন্যে যখন থেমে গেল রাইফেলের শব্দ, রাস্তার বুক থেকে শোনা গেল ট্রাকের অশান্ত গর্জন, মিলিটারী বুটের খট খট, দরজা ভাঙার শব্দ, হুইসিলের তীক্ষ্ণ আওয়াজ। তারপর সবকিছুই ডুবে গেল গোলা ফাটার নারকীয় শব্দে। ভোরের কুয়াশা ছিঁড়ে এমন একটা আশ্চর্য সকাল এলো, যা কেউ কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি।

পাখিবিহীন একটা সকাল।

'ভেতরে যাও, ভেতরে যাও সব…' রাস্তা থেকে ছুটে আসা সেই লোকটির ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর। 'ওরা হয়তো প্রতিটা ঘর অনুসন্ধান করবে। যদি কিছু পায় সবাইকে গুলি করে মারবে। বরং ঘরে দরজা দিয়ে ঘুমবার ভান করো।'

ওপর তলা থেকে এলো কার কর্কশ কণ্ঠস্বর। শব্দগুলো বোঝা না গেলেও, অস্পষ্ট আলোয় জ্বরতপ্ত ঘুম থেকে উঠে আসা উন্মত্ত রক্তিম মুখটাকে ওরা চিনতে পারলো! রেঝসেক! ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে, রেলিংটা আঁকড়ে ধরেছে দুহাতে। মাতালের মতো পাদুটো কাঁপছে। পরনে শুধু পায়জামা। জামার বোতামগুলো সব খোলা।

'এই যে, সবাই রয়েছো দেখছি!' স্খলিত কণ্ঠে টলতে টলতে সে প্রতিবেশীদের মাঝে এসে দাঁড়ালো। তারপর আঙুল উঁচিয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'এখন সবাইকে গুলি করে মারুক। ঠিক হ্যায়! তোমাদেরই তো দোষ। তোমরা সবই জানতে, তবু চুপ করেছিলে…'

কে যেন তাকে ধাক্কা দিলো, 'যাও যাও, খুব হয়েছে, আর মাতলামো করতে হবে না।' ওরা তাকে থামিয়ে দিলো। কেউবা স্মৃতিশক্তি হারিয়েছে ভেবে ভয়ে পিছিয়ে এলো। রেঝসেক কিন্তু সবাইকে উত্তেজিত করে তুললো, অভিনেতার মতো হাত ছুঁড়ে চিৎকার করলো। মুখে তার অ্যালকহলের তীব্র গন্ধ, ঝুলে পড়া শিথিল চিবুকে অশ্রুধারা।

'চুপ করো। চিৎকার না করে একটু থামতে পারো না। এখানে কি লুকনো আছে জানো?'

'আমরা তার কি জানি?'

'ধেড়ে মাতাল কোথাকার।'

'যাও যাও, আমরা কি এখানে সব জেনে বসে আছি নাকি?'

কে যেন তাকে ঠেলে দিলো। সে হাত ছুঁড়লো। 'বেশ, ঠিক আছে! আমিও দেখে নেবো, পিঁয়াজি মারা তখন বেরিয়ে যাবে। তোমরা·· তোমরা সব জানো। এখানে, এই জানলার পেছনে, পুলিসের খাতায় নাম না লেখনো একটা কুত্তীর বাচ্ছা লুকিয়ে আছে। এখুনি ওরা তাকে খুঁজে বের করবে, তারপর দুম্ দুম্···হা হা হা। একেবারে অক্কা!'

হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন এক হাতে তার মুখ, অন্য হাতে তার গলাটা চেপে ধরলো। পাগলের মতো রেঝসেক ছটফট করে উঠলো, কিল ছুঁড়লো বাতাসে। সামনেই কার ছোট্ট বাচ্ছা যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলো। মেয়ের দূরে সরে গেল, দেখতে পারলো না—শব্দহীন অথচ আর্তনাদভরা যন্ত্রণার খণ্ডযুদ্ধ। 'আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও', প্রচণ্ড একটা গুলির শব্দে ডুবে গেল তার আত্মসমর্পণের করুণ মিনতি।

'চুপ! আর একটিও কথা নয়।'

'বেশ!' উন্মত্তের অস্বাভাবিক শক্তিতে নিজেকে সে কোন রকমে ছাড়িয়ে নিলো, টলতে টলতে আছড়ে পড়লো দেওয়ালের গায়ে। সবাই স্তম্ভিত। ছেঁড়া সার্টটা ঝুলছে, নিশ্বাস নিতেও বুঝি কষ্ট হচ্ছে, 'তোমরা···তোমরা সবাই পাগল বুঝেছো? আমি চাইনি, শুধু এই ইহুদী কুত্তীটার জন্যে···দাঁড়াও না, মাগি যাবে কোথায়। এখনো সময় আছে, আমি নিজেই কুত্তীর বাচ্ছাটাকে গর্ত থেকে টেনে বার করবো···'

দুচোখে ওদের স্তব্ধ বিস্ময়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে দলছাড়া খ্যাপা বুনো মোষের মতো ছুটে গেল ছোট ঘরটার দিকে। সমস্ত শক্তি দিয়ে

আঘাত করলো দরজায়। আঘাতের পর আঘাত। হিংস্র ক্রুদ্ধতায় সে দরজাটা ভেঙে ফেলতে চাইলো, পাকে পাকে উঠে এলো অস্ফুট আর্তনাদ। বুকের অতল থেকে উঠে আসা হিংস্র পশুর নিঃসীম ঘৃণায় সে অন্ধ। দরজা খোল্। সারা বাড়ি, প্রতিটা ঘরে, দরজা, জানলার পর্দায় এসে বিঁধলো, প্রতিধ্বনিত হলো তার সেই চাপা গর্জন—দরজা খোল্।

বাইরে এখন দ্রুত সকাল হচ্ছে। পৃথিবীর সাজ বদলে নিচ্ছে বাউলের নানান রঙে। তারই একটা গোলাপী আভা জানলা দিয়ে লাফিয়ে ঢুকে পড়ছে ভিতরে। আর দরজার বাইরে সমানে চলেছে ক্রোধোন্মত্ত হিংস্র পশুর গলিত গর্জন। ঘরের মাঝখানে এস্টার দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা উন্মুখ। শ্লথ হয়ে আসছে নিশ্বাস, বুঝি এখুনি থেমে যাবে। বন্ধ হয়ে এলো চোখের পাতা। আঃ কি হিমেল শান্তি! এই বুঝি ভালো। বিদায় পৃথিবী, বিদায়! এখুনি সব শেষ, শুধু বন্ধ চোখ আর মৃত্যুর মতো গাঢ় অন্ধকার। সারা বুক জুড়ে কি যে দুঃসহ যন্ত্রণা, সে শুধু তোমারই জন্যে পল! তুমি কোথায়? কেন এলে না? রক্তের প্রতিটি শিরায় অনুতে অনুতে আমি যে এখনো তোমাকে স্পষ্ট অনুভব করছি, পল।

পল!

দরজায় অজস্র শিলাবৃষ্টি আর রুদ্ধশ্বাস হিংস্র পশুর চাপা গর্জন আবার ওকে টেনে আনলো বাস্তব পৃথিবীতে, যেখানে দাঁড়িয়ে ও স্বপ্ন দেখছিলো তার নিবিড় ভালবাসার। দরজার কপাট ফাটার শব্দ। এবার! এখন কোথায় যাবে? পাগলের মতো ও দুটি দেওয়ালের কোণে এসে দাঁড়ালো, যেন ওত পেতে থাকা শিকারী একটা বনবেড়াল। কিন্তু তারপর? জানলার কাছে? তারপরেই তো আবার ফিরে আসা। তাহলে সোফার নিচে? নিঃসীম ভয় আর কান্নায় ও ভেঙে পড়লো। বুকের মধ্যে কি যেন একটা নখে নখে ছিঁড়ে ওকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে চাইছে। সোফার মধ্যে নিজেকে আছড়ে ছুঁড়ে দিয়ে দুহাতে এস্টার কান চেপে রইলো।

'বেজন্মা কুত্তী কোথাকার, দরজা খোল্!'

আশ্চর্য এক উত্তেজনা। ওকে আবার টেনে তুললো, ছুটে গেল অন্য দরজার দিকে। দরজা খুলে হারিয়ে গেল দোকানের নির্জনতায়। জানলাগুলো বন্ধ। তখনো অন্ধকার। টলতে টলতে সামনেটা হাত দিয়ে অনুভব করলো। টেবিল চেয়ার, দর্জির ডামি, একরাশ কাটা কাপড়, কাঁচি। কাঁচিটা তুলে নেবে,

ধারালো মুখটা বসিয়ে দেবে নিজের বুকে...যেখানে এখনো কেঁপে উঠছে হৃদয়ের স্পন্দন। তারপর সব শেষ! আঃ কি অবিল শান্তি। অসহ্য যন্ত্রণায় কপালের শিরা উপশিরাগুলো দপদপ করছে। শিথিল হয়ে আসছে পায়ের পাতা। চেতনাকে আচ্ছন্ন করে নিঃসীম একটা হতাশা, একটা যন্ত্রণা...চাবুকে চাবুকে ওকে কেবলই রক্তাক্ত করে চলেছে। হিংস্র পশুর গলিত তর্জন আর গুলির শব্দ...তাহলে? একহাতে ছোট্ট সুটকেস, অন্যহাতে সেলাই মেশিনের মসৃণ ঢাকা ধরে ও নেমে এলো। হয়তো এই শেষ, নিস্তব্ধতা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। আ! কেমন যেন মিষ্টি একটি আমেজে নিজেকে ও হারিয়ে ফেললো।

আলো!

কিন্তু কেমন করে তা হবে? সব শেষের এই মুহূর্তে...তবু ঘন চোখের পাতা থেকে ক্ষীণ একটা আলোর রেখা এসে পড়েছে ওর মুখে। সমুদ্র ঝিনুকের মতো বন্ধ চোখ। চকিতে অনুভব করলো কোমল হাতের একটা স্পর্শ। কানের কাছে অস্পষ্ট একটা কণ্ঠস্বর, 'কোন ভয় নেই। আমার সঙ্গে এসো, তাড়াতাড়ি...' নিজের কানেও বুঝি বিশ্বাস করা যায় না। এমন কি বলিষ্ঠ দুটি হাত যখন ওকে তুলে নিয়ে এলো ঘরের মধ্যে, তখনো না। 'এবার সোজা হয়ে দাঁড়াও', নিশ্বাসবিহীন রুদ্ধ তার কণ্ঠস্বর। আর ও যেন রাগে মুখ ভার করে থাকা ছোট্ট একটা মেয়ে।

'লক্ষ্মী সোনা, এখন একটু ঠিক হয়ে দাঁড়াও।'

হাতদুটো আলগা করে দিতেই ও পড়ে গেল একরাশ নরম কাপড়ের মধ্যে। মসৃণ একটা পশমী চাদর ঢেকে দিলো এস্টারের সারা শরীর। তারপর সবকিছুই নিস্তব্ধ আর অন্ধকার।

'এখানে চুপটি করে শুয়ে থাকো, একটুও শব্দ করবে না...আমি যখন বললো...'

কিন্তু ওর সুটকেস! সুটকেসটা কোথায়? হাত বাড়িয়ে পেলো, চেপে ধরলো বুকের মধ্যে। তারপর যতটা সম্ভব নিজেকে গুটিয়ে হারিয়ে দিলো ক্লান্তির নীলিম শয্যায়। ও আর চোখ খুলবে না, কোনদিনও না।

১৩

ক্রোধোন্মত্ত পশুর আবার সেই গলিত তর্জন। দরজাটা কোন রকমে ভেঙে ফেলেছে সে। বিশাল দেহটা টেনে নিয়ে এলো ঘরের ভেতরে। অন্ধকারেই দেওয়াল হাতড়ে সুইচটা খুঁজলো। শিকারী নিশ্বাস তার বাঁশির মতো প্রতি-ধ্বনিত হলো নিরুদ্ধ বাতাসে। তরল অন্ধকারে সে শয়তানের মতো মিটমিট করে তাকালো। হাতের পেছন দিয়ে চোখ ঘসে আরো স্পষ্ট করে দেখার চেষ্টা করলো। তবে কি চিড়িয়া পালিয়েছে! বারান্দায় সেই অশুভ মানুষের ছায়ামূর্তিগুলো ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছে তার পেছনে। কাঁধের কাছে সে স্পষ্ট অনুভব করলো ওদের উষ্ণ নিশ্বাস।

সে দেখলো দোকানের দিকের দরজাটা অর্ধেক খোলা। বিশাল কাঁধটা টেনে আনলো দরজার মধ্যে। কিন্তু একরাশ অন্ধকার যেন দু'নখে আঁচড়ে তাকে ক্ষত বিক্ষত করে তুললো। অন্ধকার ছিঁড়ে তীক্ষ্ণ একটা আলো এসে পড়েছে তার মুখে। ঝুলে পড়া রুক্ষ চোয়ালদুটো হিংস্র ক্রুদ্ধতায় রক্তিম। হঠাৎ আলোয় চোখদুটো মিট মিট করে জ্বলছে, মুখটা যেন প্রাগঐতিহাসিক যুগের কোন বন্য মানুষের মতো।

'কি চাই ?' অন্ধকার ঘর থেকে ভেসে আসা জলদগম্ভীর একটি কণ্ঠস্বর। ভয়ে রেঝসেক চমকে উঠলো। বাতাসে হাত মুঠো করে আর একপা এগিয়ে এলো, 'ও কোথায় ? আমি জানি এখানে লুকিয়ে আছে...' আলোর তীক্ষ্ণ রেখা থেকে চোখ আড়াল করে আরো একটু এগিয়ে এলো। তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর তাকে বাধা দিলো, 'ব্যাস ব্যাস, আর এক পাও না। চুপ! যদি কোন প্রয়োজন থাকে রাস্তা দিয়ে ঘুরে এসো। ওরা তোমাকে কুকুরের মতো গুলি করে মারুক।'

হঠাৎ জানলার শাসি কাঁপিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল একঝাঁক গুলির শব্দ।

'কে তুমি ?' ফিস ফিস করে রেঝসেক জিগেস করলো।

'তাতে তোমার কি ? কি চাই এখানে ?'

'সেই ইহুদী কুত্তিটা লুকিয়ে নেই এখানে ?'

'ধেড়ে শয়তান কোথাকার! কি ভেবেছো তুমি ? বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে। পারো নরকে গিয়ে খোঁজ...ব্যাস, যদি আর একটিও কথা বলো, জেনো কবরে যাওয়ার সময়টুকুও পাবে না...'

'তুমি…তুমি কি বলতে চাও…'

টর্চের আলোটা এগিয়ে এলো আরো কাছে। ধূসর আলোয় স্নান করে উঠলো তার সারা মুখ। চোখ ধাঁধানো আলোয় আহত পশুর মতো গোঙাতে গোঙাতে সে পিছিয়ে এলো ভিড় করে দাঁড়ানো মানুষের মাঝে। ঘৃণায় তারা পথ ছেড়ে দিলো। রেঝসেক আছড়ে পডলো সেই সঙ্কীর্ণ ফাঁকটায়, যেন হারিয়ে গেল অরণ্যের গহন তিমিরে। 'কাছে এসো না বলছি,' স্খলিত কণ্ঠে সে চিৎকার করে উঠলো, হাতদুটো বাড়িয়ে বাধা দেবার চেষ্টা করলো। তার মুখের ওপর নরম কি যেন একটা আছড়ে পড়লো, কিছু বুঝে ওঠার আগে আর একটা। প্রচণ্ড আঘাতে তার মাথাটা ঝুলে পড়লো। প্রতিরোধের ভঙ্গিতে দু-হাত বাড়িয়ে নিজেকে বাঁচাতে চাইলো। 'এই যে এখানে!' আবার প্রতি-ধ্বনিত হলো সেই জলদ গম্ভীর কণ্ঠস্বর। সাথে সাথে কাপড়ের আর একটা ভারি রিল আছড়ে পড়লো তার মুখে। 'যাও, এবার নরকে গিয়ে খোঁজ।'

কি এক অশুভ ইঙ্গিতে ভারি হয়ে উঠলো দোকানের ভীষণ নিস্তব্ধতা। এমনকি ইঁদুরের চঞ্চলতাও বুঝি তা ভাঙতে সাহস পেলো না। বাইরে শুধু বারুদ গন্ধি বাতাসের অশান্ত আর্তনাদ আর রাইফেলের একটানা শব্দ। আলোটা নিভে গেল। লোকটা লাফিয়ে পড়ল ঘরের বাইরে, বন্ধ করে দিলো দরজার কপাট দুটো।

অস্পষ্ট ধূসর আলোয় গ্রীষ্মের একটি সকাল টেনে আনলো দুর্জয় প্রতি-রোধ। চিপেক সব কিছুই স্পষ্ট অনুভব করতে পারলো। সারাটা জীবন তার কেটেছে এদের মধ্যে। দোকানের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো, তারপর জানলার কাছ থেকে সরে এলো তার চেয়ারে। কতদিন সে এই দোকানে কাজ করে আসছে। ঝুঁকে পড়লো তার মাথা। আনত হয়ে এলো চোখের পাতা। উঃ কি দুঃসহ রক্তাক্ত এই জীবন! দুম দুম্…ছাদের ওপরের আকাশটা সহসা কেঁপে উঠলো। ঝন ঝন করে উঠলো কাচের শার্সিগুলো। উঃ মানুষ হয়েও ওরা এত কুৎসিত, এত নগ্ন! ভয়ে রুদ্ধ হয়ে এলো তার কণ্ঠ, তবু কিছুই ভাবলো না। কি প্রয়োজন? ঝরা পাতার মতো রিক্ত একটি বৃদ্ধ—বউ নেই ছেলে নেই ঘর নেই, সারা জীবন যার শুধু তাস খেলে কাটলো—কি দর-কার তার পৃথিবীর দরজায় দরজায় কড়া নেড়ে বেড়াবার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সেই গ্যালেসিয়া…উঃ কি আশ্চর্য এই পৃথিবী।

ছোট্ট একটি শব্দে সে পেছন ফিরে তাকালো। সহসা ভাবনাগুলো তার এক ঝাঁক ডানামেলা পাখির মতো ঢেউ খেলে গেল সুদূর দিগন্তে।

দরজার সামনে এস্টার দাঁড়িয়ে। এলোমেলো রুক্ষ চুল, কান্নায় ভেজা মুখ। অস্পষ্ট আলো অন্ধকারে ওকে দেখে চিপেক চমকে উঠলো। সেই হলুদ তারা, হাতে ছোট্ট সুটকেস। চিপেক উঠে দাঁড়ালো। এস্টার যেন তাকে দেখতে পায়নি, হয়তো দেখতে চায়নি। মন্ত্রমুগ্ধের মতো ও দরজার দিকে এগিয়ে চললো। তার আগেই চিপেক পথ রোধ করে দাঁড়ালো। ওর দীর্ঘ আয়ত দুটি চোখের উদাস দৃষ্টিকে সে সহ্য করতে পারলো না। হাতদুটো ওর কাঁধের ওপর রাখলো, যেন মৃদু নাড়া দিয়ে ওকে জাগিয়ে দিতে চাইলো।

'একি! কোথায় যাচ্ছো?'

'আমাকে যেতে দাও!'

'ছিঃ এখানে শুধু আমি, আর বাইরে ওরা সবাই, শুনতে পাচ্ছো না?'

'আমাকে যেতে হবেই', ম্লান ওর কণ্ঠস্বর। আমি চলে যাবো, আমাকে যেতে দাও, নইলে ওরা পলকে গুলি করে মারবে।'

'কিন্তু কোথায় যাবে?'

'টেরাঝিনে। বাবামণি মামণি হয়তো আমার জন্যে সেখানে অপেক্ষা করছেন, তাছাড়া আমি আর এখানে থাকতে চাই না। বাধা দিও না আমাকে, যেতে দাও...নইলে ওরা তাকে গুলি করে মারবে, এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না।'

ওর শীর্ণ কাঁধ ধরে সে নাড়া দিলো, লতার মতো কেঁপে উঠলো ওর সারা শরীর। সমস্ত শক্তি দিয়ে চিপেক ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো। আদর করে হাত বুলিয়ে দিলো ওর সারা মুখে, মাথায়, চুলের গভীরে। ধূসর চোখের পাতা থেকে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গলে গলে ঝরে পড়লো তার রুক্ষ চিবুকে। চিপেক কাঁদছে। কাঁদছে ওর জন্যে, কাঁদছে নিজের জন্যে, কাঁদছে হিংসা উন্মত্ত এই নিষ্ঠুর পৃথিবীর জন্যে।

তার করুণ মিনতি ও শুনলো না।

'তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে যেতে দাও।'

'না, তা হয় না।'

আহত বনবেড়ালের মতো সমস্ত শক্তি দিয়ে এস্টার নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো, 'যেতে আমাকে হবেই!' চিপেক কল্পনা করতে পারেনি,

হঠাৎ তার বুকের ওপর হাত রেখে প্রচণ্ড শক্তিতে এস্টার তাকে ঠেলে দিলো, আর চিপেক ঘুরতে ঘুরতে টেবিলের কোণে ধাক্কা খেয়ে আছড়ে পড়লো একটা চেয়ারের ওপর। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলো বৃদ্ধ। বাধা দেবার আগেই অন্ত পাশে চাবির হাতলটা ও ঘুরিয়ে দিলো। দরজাটা একপাশ থেকে খুলে যেতেই চকিতে ও বেজির মতো গলে পড়লো। সাথে সাথেই দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। ও এখন বাইরে—বারান্দায়।

বারান্দাটা নির্জন।

চারদিকে ও তাকিয়ে দেখলো, চলকে উঠলো রক্তস্রোত। বুকটা পাগলের মতো কাঁপছে। অন্ধকার ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ও নেমে এলো। জীর্ণ কাঠের সিঁড়িতে প্রতিধ্বনিত হলো জুতোর খটখট শব্দ। বাইরের বিষণ্ণ ভারি বাতাস। ডানদিকে পেছনের উঠানে ভাঙা একটা ঠেলা গাড়ি আর উপচে পড়া ডাস্ট-বিনের ঝাঁঝালো গন্ধ। বাঁদিকে বাইরের দরজা। দরজার দিকে ও ছুটে গেল। সামনেই পাহারারত একটি ছায়ামূর্তি, স্তব্ধ বিস্ময়ে সে চিৎকার করে উঠলো। দুহাতে এস্টার তাকে সজোরে ঠেলে দিলো। মুহূর্তের জন্যে হাতের তালুতে অনুভব করলো পিতলের হাতলের হিমেল স্পর্শ। একটানে দরজাটা ও খুলে ফেললো—তারপরেই রাজপথ।

আলো! যদিও সূর্য তখনো ওঠেনি, তবু অজস্র আলো।

বারুদগন্ধি বাতাসে স্তনিত বজ্রনিনাদ। এস্টার স্তম্ভিত। ছুটে গেল গুলির শব্দ। ওর ঠিক পেছনেই বন্ধ দরজাটা। সারা দেহ টানটান, দেওয়ালের সঙ্গে মিশে শক্ত হয়ে ও দাঁড়ালো। এলোমেলো দোকানের বিজ্ঞাপন—কফি, মদ, স্পিরিট গাম। এবার ও ওদের দেখতে পেলো। চাকতে বন্ধ করলো চোখের পাতা, আবার খুললো। তখনো ওরা সেখানে। ভয়ে শিউরে উঠলো, তবু সরিয়ে নিলো না চোখের দৃষ্টি।

রাস্তার ওদিকে বাঁধানো ফুটপাথের একপ্রান্তে ওরা দাঁড়িয়ে। বাড়িগুলোর দিকে পেছন ফিরে—বিচ্ছিন্ন দুটি সারি। ওদের মুখ ও দেখতে পেলো না। রাইফেলের মুখগুলো সামনের দিকে উদ্ধত, মাথায় হেলমেট, পাথরের মূর্তির মতো ওরা নিশ্চল। যেন মৃত্যুলীন অসংখ্য প্রেতচ্ছায়া। আশ্চর্য, ওরা এখনো ওকে দেখতে পায়নি।

মরিয়া হয়ে ও চারদিকে তাকালো। এবার? রুদ্ধশ্বাস, দেওয়ালের দিকে

পিঠ করে, বন্ধ জানলা দোকানের দিকে ফিরে—গুঁড়ি মেরে ও এগিয়ে এলো রাস্তার সেই কোণে। মাত্র আর কয়েক পা, আশ্চর্য ওরা এখনো দেখতে পেলো না! শুনতে পেলো না ওর বুকে বেজে চলা উদাত্ত ঘন্টাধ্বনি। ক্লান্ত একটা অবসাদ, যেন নিজেকে ও কোথায় ফেলে এসেছে। ঘন সবুজ তরল অন্ধকার থেকে যে এইমাত্র বেরিয়ে এলো, সে যেন অন্য কেউ, অন্য কোন অপরিচিত অবয়ব। এ যেন স্বপ্ন। না না,এতো সত্যি—আঃ পল, তুমি যদি একবার দেখতে পেতে।

আর এক পা, তারপরেই ঐ কোণটিতে পৌঁছে যাওয়া।

নিজের পা বুঝি আর বিশ্বাসঘাতকতা না করে পারছে না, টলছে, ভয়-তাড়িত উন্মাদ আতঙ্কে কেবলই জড়িয়ে আসছে। ওরা বুঝি এখনি এই গলির মোড়ে টেনে নামাবে ওর প্রাণহীন বিবর্ণ দেহটাকে। না না, এখান থেকে পালাতে হবে, যেমন করেই হোক—অনেক অনেক দূরে।

দরজাগুলো সব বন্ধ, জানলাগুলো অন্ধকার।

অন্য একটা গলির মোড় থেকে শুনলো হুইসিলের বুকফাটা আর্তনাদ, যেন ছিলা ছেড়া শনশন তীরের তীক্ষ্ণ ফলা। তবু ও কিছুই দেখলো না, শুনলো না—এখান থেকে অনেক, অনেক, অনেক দূরে। নিঃশব্দ কান্নায় ভিজে উঠলো সারা দেহ। তবু বাতাসে বুক ভরে নিলো অমিত শক্তি—এখান থেকে দূরে দূরে আরো দূরে। কাছেই কোথায় যেন হুইসিলের শব্দ, আবার—চারদিকেই শন শন তীরের সেই তীক্ষ্ণ প্রতিধ্বনি। কাঁটা-মারা বুটের আওয়াজ—এক দুই একশো হাজার, সামনে, খুব কাছেই, তাহলে? ছোট্ট গলিটা আবার এসে শেষ হলো রাজপথে। এককোণে মিলিটারী ট্রাক, আর চারদিকে অসংখ্য ছায়ামূর্তি, মাথায় হেলমেট, ধূসর-সবুজ। আ! এখানেও ওরা…

চকিতে ও দরজার দিকে পেছিয়ে এলো। আরো আরো—বিশাল দরজার কড়াটা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত এস্টার হরিণ-নিঃশব্দ পায়ে পেছিয়ে এলো। সজোরে টানলো। বন্ধ। তাহলে এখানেই সব শেষ! ভাবতেও কেমন জানি একটা মিষ্টি আমেজ। যদিও সারা দেহ, প্রতিটি শিরা উপশিরা ওর কাঁদছে, তবু কান্নার একটি সুর ওকে ফিরিয়ে আনলো বাস্তব পৃথিবীতে। পাগলের মতো চারদিকে তাকালো। একটু দূরেই, হাঁ-মুখ অন্ধকারে ছোট্ট একটা গলি।

শিকল ছেঁড়া পাখির মতো ও পিছোল পাথরের ওপর দিয়ে ছুটলো।

সামনে ঝাঁঝালো গন্ধভরা তরল অন্ধকার, বাথরুমের নোংরা গন্ধ, মদের পুরনো ভাঙা বোতল, মুখ ভার করে থাকা মেয়ের মতো থমথমে বাতাস।

সংকীর্ণ উঠোনের পাশ দিয়ে গলিটা চলে গেছে যেন কোন অতল অন্ধকারে। অসংখ্য চোখ স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখছে, ও কিছুই ভাবলো না—টলতে টলতে শুধু ছুটে চললো সামনের দিকে। দুপাশের জীর্ণ দেওয়াল থেকে চুনবালি খসে খসে পড়ছে, চুলগুলো উড়ছে বাতাসে। সহসা ও থমকে দাঁড়ালো। বাতাসের বুক চিরে ছুটে গেল বাঁশির তীক্ষ্ণ শব্দ, দুম্! আরো,আরো কয়েকটি গুলির শব্দ একসাথে ছুটে বেরিয়ে গেল। হঠাৎ মনে হলো অন্ধকার গলিটা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে, তলিয়ে গেছে—আর যেখানে ও দাঁড়িয়ে আছে, নিজে চোখেও বুঝি বিশ্বাস করতে পারছে না, সেখানেও ধূসর-সবুজ সেই ছায়ামূর্তিগুলি।

আলো!

উর্মিল আনন্দে এস্টার চিৎকার করে উঠতে চাইলো—আলো! পায়ে পায়ে ও এগিয়ে এলো আলোর আরো কাছে। মাত্র আর কয়েক পা—তারপরেই রাজপথের ওপারে, পার্কের সবুজ ঝোপে, ভোরের শিশিরভেজা ঘাসে ঘাসে আলোর সমুদ্র। ঈশ্, সকালের সূর্যটা কি আশ্চর্য সুন্দর,আর রাশিরাশি কোমল অন্ধকারকে কেমন দুহাতে মুঠো মুঠো ছড়িয়ে দিচ্ছে—দুম্! দুম্! মাত্র আর কয়েক পা পরেই কোমল ঘাসের স্পর্শ। পায়ের আঙুলগুলো ডুবে যাবে, ছোট্ট প্রজাপতির মতো নিজেকে ও হারিয়ে ফেলবে ঘাসের গভীরে। ঝোপের ওপারে সাদা মতন কি যেন চিক চিক করছে···ঐ তো, ওদের বাগান, হ্যাঁ·· ওটাই তো পাখি তাড়ানো সেই খড়ের মানুষটা! ও কি তবে ছুটে যাবে কিংবা উড়ে যাবে স্বচ্ছ বাতাসে হালকা পাখা মেলে...বাবামণি। আবিল আনন্দে চিৎকার করে ডাকবে—বাবামণি! আমি আসছি, একটু দাঁড়াও···খুব অবাক লাগছে, তাই না বাবামণি? না না, আমি জানি তুমি এখনো এখানে, তবে আমাকে চিঠি দাওনি কেন? ওরা নিশ্চয়ই কোথাও হারিয়ে ফেলেছে। উঃ কি যে ভাল লাগছে না, জানো বাবামণি, আমি ওকে ভী-ষ-ণ ভালবেসেছি। আমাদের দুজনকে তুমি ঘরে নিয়ে চলো। আমার ভয় করছে, তবু ওরা আমাকে ধরতে পারেনি···বাবামনি, তুমি একটু দাঁড়াও আমি যাচ্ছি·

অন্ধকার গলি থেকে ও বেরিয়ে এলো। শুনতেও পেলো না চারদিক থেকে বেজে চলা শনশন সেই বাঁশির তীক্ষ্ণ শব্দ, পেছনেই ছুটে আসা মানুষের আদিম অরণ্য উল্লাস, রাইফেলের সমুদ্র গর্জন। অবাক চোখের পাতায় ওর শুধু স্তব্ধ বিস্ময়—ও এখন পার্কের ভেতরে, আঃ কি হিমেল শান্তি!

সহসা এস্টার ঢলে পড়লো ঘাসের বুকে। প্রসারিত দেহ, মাটির নিবিড়

আলিঙ্গনে ছড়ানো দুটি বাহু, আঙুলে হিমেল স্পর্শ। ভোরের শিশিরে, ঘাসে ঘাসে ডুবে গেল ওর কালো চুলের অরণ্য। থেমে গেল গুলির শব্দ। চারদিক নিস্তব্ধ, নিথর। ঝড় শেষের একটুকরো নিতল নিস্তব্ধতা। ও কিছুই দেখলো না, শুনলো না—এমন কি কাঁটা মারা বুটের ভারি শব্দ যখন প্রতিধ্বনিত হলো আরো কাছে, তখনো না। মুহূর্তের জন্যে ওরা থমকে দাঁড়ালো। তারপর একজন বুট দিয়ে নিঃশব্দে ওকে ঘুরিয়ে দিলো সূর্যের দিকে মুখ করে।

শান্ত স্বর, স্তব্ধ বিস্ময়ে কে যেন বললো: ইহুদী!

পুরনো বাড়িগুলো সত্যি যেন বৃদ্ধ মানুষের মতো—স্মৃতিভারাবনত।

ওদেরও নিজস্ব জীবন আছে, স্বতন্ত্র একটা অবয়ব। জীর্ণ দেয়ালের পাঁজরে পাঁজরে হৃদয়ের স্পন্দন, দীর্ঘায়ত জীবনের অতীত স্মৃতিচিহ্ন। কি দেখেছে ওরা, কিইবা শুনেছে? সীমিত চার দেওয়ালের সংকীর্ণতায় বাসকরা মানুষের দুঃখ সুখের পালা, বিয়গান্ত নাটকের অনন্য অভিনয়। হ্যাঁ, কাউকে এখনো মনে পড়ে, কেউবা হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির গহন তিমিরে, আর কেউ যাদের কোন স্মৃতিচিহ্নই নেই, দক্ষিণ নায়ক, ওরাও এ বাড়ির চলমান ইতিহাসের অবিচ্ছিন্ন অংশ।

তোমাকে বাঁচতে হবে পল, রক্তের কল্লোলে সে শুনতে পেলো কার যেন অনন্য কণ্ঠস্বর। সে চিনতে পারলো।

জানলার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে সে এখনো শুয়ে। বাইরের রক্তমেঘ ছিঁড়ে খুব সাধারণ একটা দিন এলো। রঙহীন রেখাহীন বিবর্ণ একটা দিন। পার্কের সেই নিতল অন্ধকার থেকে পরিণতির চরম মুহূর্ত পর্যন্ত বারবার একই কেন্দ্রে ফিরে আসা…কই, কিছু তো হয়নি। দরজা ঠেলে সে ভেতরে এলো।

শূন্য ঘর। কেউ নেই!

সত্যি কি কিছু হয়নি! যা বাকি ছিলো, সে তো শুধু পথ খোঁজা। সীমাহীন শূন্যতায় পথ খুঁজে মরা। এ যেন উত্তরহীন প্রশ্নের মতো—কেউ কথা বলছে না কেন? এপৃথিবী মানুষ সবই কি নিস্তব্ধ, বোধির! কেন? কেন এমন করে সবকিছু হারিয়ে গেল, তলিয়ে গেল পিশাচের লোলুপ থাবায়? আঃ, তার আগে একটুকরো নীলিম আকাশ যদি ভেঙে পড়তো!

সারা বুক তার যন্ত্রণায় ভিজে উঠলো।

অজস্র মুখ, শব্দ আর কণ্ঠস্বর কণ্ঠস্বর! উদাও ঘন্টাধ্বনি। যখনি চোখ বন্ধ

করে সে স্পষ্ট শুনতে পায়—তোমাকে বাঁচতে হবে পল। কিন্তু কেমন করে ? তীক্ষ্ণ একটা প্রশ্ন। কিন্তু কণ্ঠস্বর তার চেয়ে অনেক বেশী তীক্ষ্ণ। সে স্বরের অনুরণন তার হৃদয়ে কেবলই ঘণ্টাধ্বনির মতো বেজে চলে। রাত্রির নিটোল অন্ধকারে সে যখন যন্ত্রণায় নুইয়ে পড়ে, তলিয়ে যায় বিস্মৃতির অতল গভীরে, কে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে : পল, শুনতে পাচ্ছো না, আমি এস্টার !

দুঃসহ যন্ত্রণায় সে আর্তনাদ করে উঠলো।

দুহাতে সে জানলাটা খুলে দিলো আর একঝাঁক দুষ্টু চড়ুই ঝগড়া করতে করতে ঢুকে পড়লো ঘরের ভেতরে। এতক্ষণ সে যেন সুন্দর একটা স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলো। চোখ ঘসলো দুহাতে। তখনি মনে হলো, প্রচণ্ড ক্ষুধা যেন তাকে সমানে চাবকে চলেছে। তাইতো ? নিজেকে টানটান করে মেলে দিয়ে সে হাই তুললো। বুক ভরে নিলো ভোরের স্বচ্ছ বাতাস। ভাঙা ঠেলাগাড়ি-সমেত সেই নির্জন প্রাঙ্গন, ছাদের ওপরে একটুকরো নীলিম আকাশ, নিঃশব্দে ঘুম ভেঙে জেগে ওঠা একটা নিশান্তিকা।

সূর্যের প্রথম আলোর রেখাটা পুরনো ছাদের কিনার থেকে লাফিয়ে পড়ে হারিয়ে গেল বাদাম গাছের ঘন পাতার আড়ালে।

তবু, তবু তাকে বাঁচতে হবে !

ভোরেও পুরনো বাড়ির নিজস্ব একটা কণ্ঠস্বর আছে, কান পেতে শোন—কে যেন আপন মনে শিস দিতে দিতে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। বারান্দায় স্যাণ্ডেলের শব্দ, শিশুর কান্না, অজস্র কণ্ঠস্বর। কলতলায় টিপটিপ জল পড়ার শব্দ,কোথায় যেন ঝরনার মতো খলখল মেয়েলি হাসি—হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে ওঠা বাড়িটা আশ্চর্য মুখর। আর কাদের যেন রান্নাঘরের খোলা দরজা দিয়ে বাতাসে ভেসে আসছে কফির গন্ধ···